জয়দেব

(প্রথম খণ্ড)

জীবনী, কাব্য-পরিচয়, গীত-গোবিন্দের ধর্ম্ম ও
সমসাময়িক সমাজ-চিত্র।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে প্রণীত



মূল্য ১৲

১১১।৪ এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা।

জয়দেব ও তৎপ্রণীত গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যে কিছু দিন হইতে একটা কু-ধারণা চলিয়া আসিতেছে এবং বঙ্গদেশীয় কবি বঙ্গদেশেই অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইতেছেন দেখিয়া ১৩১৩ ও ১৩১৪ সালে "জয়দেব ও তদানীন্তন কালের সমাজচিত্র" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাণী নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী সাধারণের বিশেষ মনোমত হওয়ায় আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই উক্ত প্রবন্ধ ও জয়দেবের জীবনী প্রভৃতি সমন্বিত গীতগোবিন্দ কাব্যের একখানি সহজবোধ্য ও ভাল সংস্করণ বাহির করিবার জন্য উপদেশ দেন। সক্ষম হইব কি না এ বিষয়ে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া জয়দেব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কতকগুলি ছাপান ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। অনেক পরিশ্রমে বহুদিন পূর্ব্বেই পুস্তকের খসড়া প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু আমার সময় ও সামর্থ্যের অভাবে এতদিন ফেলিয়া রাখিতে হইয়াছিল এবং ছাপাইতে অগ্রসর হইব কি না এবিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি চণ্ডিদাস ও জয়দেব সম্বন্ধে বঙ্গদেশের মধ্যে কিছু দিন হইতে প্রত্নতত্ত্বের হিড়িক উঠিয়াছে; এক চণ্ডিদাস ১০।১৫ জন হইয়া পড়িয়াছেন এবং জয়দেব একজন গেঁয়ো কবির বাঙ্গালা লেখা হইতে হুবহু নকল করিয়া তাঁহার "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" প্রভৃতি গান রচনা করিয়াছেন—এই সকল কথা এবং এতদপেক্ষা আরও অনেক গুরুতর কথা দেশের মধ্যে প্রচার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, আমার লিখিত পুস্তক খানি অতি বিনীতভাবে সুধী-সমাজে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যে অজানিত নির্ম্মল জীবন বঙ্গের কোন্ অজানিত পল্লীর কোন্ ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া কবিত্বের ঝঙ্কার দিয়াছে,

আর সেই কবিত্বে আমাদের বঙ্গভাষাকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদেরই ভাগ্য আজ প্রত্নতত্ত্বের মহারথীদিগের কর্কশ কশাঘাতে জর্জ্জরিত।

জয়দেবের জীবনী, কাব্য-পরিচয় ও ঐতিহাসিক সমালোচনা এই তিনটী অংশ বর্ত্তমান পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। একুশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ বাণী নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—তাহাই পরিবর্দ্ধিত আকারে এখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে গীতগোবিন্দ কাব্যের মূল, অন্বয় ও টীকা, বঙ্গীয় অনুবাদ ও ভাবের ব্যাখ্যার সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পুস্তকের পাঠান্তর, এবং বঙ্গভাষা জয়দেবের নিকট কতটা ঋণী তাহা দেখাইবার জন্য, বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবিদিগের লেখা হইতে ভূরি ভূরি অনুরূপোক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত-না-জানা ব্যক্তিও যাহাতে সহজে গীতগোবিন্দ বুঝিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে টীকা ও অনুবাদ যথেষ্ট সরল অথচ সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদি বর্ত্তমান পুস্তকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে সত্বর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

এই পুস্তকে জয়দেব সম্বন্ধে চর্ব্বিতচর্ব্বণ কোন কথাই লেখা হয় নাই; পাঠক মাত্রেই দেখিবেন ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে, জয়দেব সম্বন্ধে কুধারণা যদি অন্তর্হিত হয় তবেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক। জয়দেব আমাদের দেশের কবি।

ঝাড়গ্রাম
২৫শে শ্রাবণ ১৩৩৪।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে।

সূচীপত্র।

গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম ও সমসাময়িক সমাজচিত্র।

জয়দেব

(প্রথম খণ্ড)

জীবনী।

১। কবির আত্মপরিচয়।

গীতগোবিন্দের মধ্যে যেটুকু আত্মপরিচয় আছে তাহা ছাড়া জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধে অন্য সকল কথাই অনুমানের উপর নির্ভর করে। গীত-গোবিন্দের মধ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। কেন্দুবিল্বে (কোন কোন পুস্তকের মতে কিন্দুবিল্ব, তিন্দুবিল্ব বা বিন্দুবিল্বে) তাঁহার বাসস্থান ছিল। এবং সম্ভবতঃ তাঁহার জন্মভূমিও ঐ গ্রামে ছিল তাহা "কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব" কথা হইতে প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী (কোন কোন পুস্তকের মতে রাধাদেবী বা রামাদেবী)। পত্নীর নাম পদ্মাবতী। পরাশিরাদি কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় বন্ধু ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা গীত-গোবিন্দের পালার গায়ক। এইটুকু ভিন্ন অন্য কোন আত্মপরিচয় গীতগোবিন্দে নাই।

বঙ্গদেশের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর সময় হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে তিনি বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন

এবং উক্ত রাজাও তাঁহার গুণে ও তাঁহার কৃষ্ণভক্তিতে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। এই লক্ষ্মণসেন বা তাঁহার সময়ের বিন্দুমাত্র পরিচয় গীতগোবিন্দে নাই, এবং একটীমাত্র সন্দেহজনক শ্লোক ভিন্ন এমন কোন শ্লোক বা ভাব এই পুস্তকে পাওয়া যায় না যাহা হইতে উক্ত প্রবাদ সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। জয়দেব কেন্দুবিল্বের নাম করিয়াছেন, ভোজদেব, বামাদেবী, পদ্মাবতী, এমন কি, পরাশরাদি প্রিয় বন্ধুরও নামোল্লেখ তাঁহার পুস্তকে করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ব্যক্তি বন্ধু অপেক্ষাও বন্ধু, যাঁহার সভাসদ তিনি ছিলেন, যাঁহার নামে আজিও বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ, যিনি বাঙ্গালার শেষ গৌরবরবি এবং প্রবাদানুসারে যাঁহার অন্নে জয়দেব পালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বা তাঁহার সময়ের, কোন উল্লেখই তিনি করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ চারিজন পণ্ডিতের নাম "জয়দেব" নামের সঙ্গে তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়; পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির দাম্ভিকতার জন্য ঐ শ্লোকটী রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সভাসদ বা সমসাময়িক বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা একমাত্র ঐ শ্লোকটী হইতেই সেই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই এবং সেইজন্যই সনাতন গোস্বামীর সময় হইতেই সেই অনুমান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ শ্লোকটী জয়দেব স্বয়ং লিখিয়াছেন কিনা এবং যদি লিখিয়াই থাকেন তাহা হইলে ঠিক অবিকল ঐরূপই লিখিয়াছিলেন কিনা তাহা বিশেষ সন্দেহজনক। ভারতবর্ষের সকল পুঁথি হাতের লেখাতেই চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল; বেদ হইতে পুরাণ ও কাব্য পর্য্যন্ত বহু উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে যে একজনের বহু রচনা অন্যের লেখার মধ্যে স্থান পাইয়া গিয়াছে। এখানে জয়দেবের গুণগ্রাহী কোন লেখক বা গীতগোবিন্দের পালার গায়ক বা কোন পাঠক যে ঐ শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়া না দিয়াছেন তাহা কে বলিল? যাহাই হউক এই শ্লোকটীর সম্বন্ধে

বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে। যদি কেহ ঐ শ্লোক হইতে জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বা তাঁহার সভাসদ মনে করেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকে জয়দেবের সময় সমালোচনা অংশে তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী সময়ের লোক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। জয়দেবের জন্মভূমি।

জয়দেব কোন্ দেশীয় লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ্যতঃ কিছুই নাই। সকল বাঙ্গালীই জানে যে বঙ্গদেশই তাঁহার জন্মভূমি। কিন্তু সংস্কৃত ভক্তমালা নামক পুস্তকের মতে তিনি উৎকলের অধিবাসী ছিলেন। জগন্নাথের পুরীর নিকট বিন্দুবিল্ব নামক কোন ব্রাহ্মণসংকুল গ্রামে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার তাঁহার বিবাহ ও পদ্মাবতী নাম্নী পত্নীলাভ যে জগন্নাথ সংক্রান্ত ঘটনা লইয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা সকল দেশের মতেই একরূপ, কোন বিভিন্নতা নাই। গীতগোবিন্দ পুস্তকের অধিকতর প্রচলন ও গৌরব উৎকলে; এমন কি, বর্ত্তমান কালেও জয়দেব সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী বঙ্গদেশাপেক্ষা উৎকল ও জগন্নাথ লইয়া, ইহা তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই বুঝা যায়।

এই দুইটী বিরুদ্ধ মতের (অর্থাৎ তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশে, কি উৎকলে) আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, অজয় নদীর তীরে বর্ত্তমান বীরভূম জেলার মধ্যে কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে পৌষসংক্রান্তিতে অদ্যাবধি একটী বিরাট মেলা বসে। এ মেলা কতদিন হইতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। উহা বহু বৎসরের পুরাতন; বোধ হয় সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রম একত্রিত করিবার জন্য জয়দেব স্বয়ং উহার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। উক্ত স্থানের নাম কেন্দুবিল্ব বা চলিত কথায়

"জয়দেব কেঁদুলি"। উৎকল ও বঙ্গদেশের মধ্যে এত স্থান থাকিতে জঙ্গলখণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ গ্রামের প্রসিদ্ধি লাভ করিবার কোন কারণ ছিল না। কেন্দুলিতে জয়দেবের সমাধি আছে এবং প্রবাদানুসারে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহেরও পূজা সেখানে হইয়া থাকে। যে উড়িষ্যায় জয়দেবের এত নাম, এই কেন্দুলির ন্যায় সেই উড়িষ্যায় তাঁহার কোন স্মৃতি রক্ষা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার জন্মস্থান উড়িষ্যায় হইলে সেখানকার অধিবাসীগণ এবম্ভূত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষায় পরাঙ্মুখ হইত না।

এবম্ভূত প্রকৃত জিনিসের সম্মুখে কেবল অনুমান বা কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে উৎকলবাসী বলিয়া স্থির করা চলে না। ভক্তমাল ভক্ত সমূহের অলৌকিক কাহিণীর প্রচারেই অধিক প্রয়াসী, তাঁহার ঐতিহাসিক অঙ্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভক্তমাল যিনি রচনা করিয়াছেন খুব সম্ভবতঃ তিনি তাহার বৃত্তান্ত কোন তীর্থযাত্রীর মুখে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন, সেই তীর্থযাত্রী কোন অশিক্ষিত বা অজ্ঞ পাণ্ডার মুখে জয়দেবের বিবরণ শুনিয়া থাকিবে।

এ সম্বন্ধে আমি আরও দুই একটী কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি :—

কেন্দুবিল্ব দুইটী পৃথক্ পৃথক্ শব্দের সংযোজনা—কেন্দ্ বা কেঁদ এবং বিল্ব। কেন্দ্ অর্থে আবলুস্ গাছ এবং বিল্ব অর্থে বেল। কেঁদ গাছ কঙ্করময় মৃত্তিকাতেই জন্মে। ইহার ফল গাবের ন্যায়, শাঁস বালকেরা এবং ইতর লোকে খায়। বীরভূমি প্রভৃতি কঙ্করময় দেশেই এই কেন্দ্ গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল ভূভাগে এই গাছের প্রাচুর্য্য হইতে কেন্দবনী, কেন্দা, কেন্দডাঙ্গা, কেন্দডাঙ্গরী কেন্দাশুলি প্রভৃতি বিস্তর গ্রামের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কেন্দুবিল্ব বা কেন্দ্বিল্ব নামও ঐ প্রকার অর্থ প্রকাশক। রাণাকুম্ভ তাঁহার টীকায় তিন্দুবিল্ব পাঠ গ্রহণ করিয়া উহাকে কুল বা জয়দেবের বংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জয়দেব যদি লক্ষ্মণ সেনেরই সভাসদ্ থাকেন তাহা হইলে উৎকল অপেক্ষা বীরভূমির কেন্দুলিই অধিকতর নিকটবর্ত্তী স্থান।

বঙ্গদেশের মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর আদি স্থান বীরভূমি, জয়দেবই সে দেশে তাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

গীতগোবিন্দের বসন্তবর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, বীরভূম প্রদেশ হইতেই তাহার আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের বসন্ত ও জয়দেবের বসন্ত বর্ণনা, এতদুভয়ের পার্থক্য যিনি বীরভূমি অঞ্চলে বাস করিয়াছেন তিনিই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত করা যায়, তাহার মূর্ত্তি মানুষ জীবনের কোন কালে ভুলিতে পারে না। তাঁহার পলাশ ও দিগন্তশোভী কেতকী বীরভূমির ন্যায় প্রদেশেই সর্ব্বাগ্রে নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। তাঁহার মধূক, তাল ও "কাসারোপবন পবন" বীরভূমেরই কথা মনে আনিয়া দেয়। জয়দেব যে একজন এবম্ভূত বনবৃক্ষরাজি শোভিত রমণীয় প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহা গীতগোবিন্দ পড়িয়া অনেকেরই মনে ধারণা হইবার সম্ভাবনা। গীতগোবিন্দের ভাষাও বঙ্গভাষারই অনুরূপ। বাঙ্গালী তাহার কোমল ভাষায় যে শব্দগুলি ব্যবহার করে গীতগোবিন্দের মধ্যে তাহাই ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। গীতগোবিন্দ হইতে কতটুকু জীবন বৃত্তান্ত পরোক্ষভাবে নির্ণীত হইতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত জীবনী সম্বন্ধে অন্য কোন আভ্য প্রমাণ পুস্তকের মধ্য হইতে পাওয়া যায় না। তবে গীতগোবিন্দের রচনা প্রণালীর মধ্য হইতে আরও কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণ তাঁহার জীবন

চরিত সম্বন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পুস্তক মনুষ্য চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে যে ধরণের মানুষ, তাহার রচিত পুস্তকের মধ্য হইতে তাহার বহু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার রীতি নীতি, ধরণ ধারণ, রুচি বিশ্বাস প্রভৃতি সকল কথাই প্রায় পুস্তকের মধ্য হইতে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই নিয়মানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে জয়দেব শুধু কবিই ছিলেন না কিন্তু তিনি একজন শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং বিশেষ করিয়া অভিধানে তাঁহার দখল খুবই অধিক ছিল। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুরাণাদিতে এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনি বিশেষরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং একজন গায়ক ও গীতবাদ্য বিশারদ ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কবিত্বের গরিমাও গীত-গোবিন্দের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেই সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি (বাচঃ পল্লবয়তি—সাধ্বী মাধ্বীক ইত্যাদি) প্রক্ষিপ্ত নহে, তাঁহারই স্বরচিত বলিয়া বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে বিদ্যাভিমান ও বঙ্গীয় কবিকুল চক্রবর্ত্তী বলিয়া একটা দম্ভ তাঁহার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান ছিল।

তিনি কৃষ্ণভক্ত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং সেই ধর্ম্মের সাহায্যেই দেশের কুপ্রথা বা কলিকলুষ নষ্ট করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক ও প্যারমার্থিক চিন্তা অপেক্ষা তাঁহার পার্শ্বস্থ মনুষ্য বা সমাজ কিসে সুপথে চালিত হইতে পারে এই চিন্তাই তাঁহার অন্তঃকরণে বোধ হয় চিরদিনই প্রবল ছিল।

কথিত আছে জয়দেব উদাসীন ভাবে কাল কাটাইয়া ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার পরে সংসারে আত্মীয় স্বজনের বন্ধনের অভাবে অথবা পার্শ্বস্থ সমাজের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া আর এ সংসারে থাকিব না বলিয়া যদিও তিনি সংসার ছাড়িয়া গিয়া থাকেন, কিন্তু তত্রাপি পদ্মাবতীর অপূর্ব্বরূপে

মোহিত হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পুনরায় গৃহে আসিয়া তিনি যে অত্যধিক মাত্রায় গৃহী হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ চলে না। গীতগোবিন্দ সম্ভোগের বর্ণনা। যে বিরহ, মান, ও সম্ভোগাদি জ্বলন্ত চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে, যৌবনের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা তাহার মধ্যে না থাকিলে সে চিত্র তত হৃদয়গ্রাহী, এমন কি প্রাকৃত জিনিস অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী, হইত না। এ মুনি ঋষির বল্কল ধারিণী ঋষি কন্যার সহিত প্রেমাভিনয় নহে কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্ববিধ সুখ ও লালসার মধ্যে কালাতিপাত করিয়া যে প্রেম ও সম্ভোগ স্বতঃই দেখা দেয় তাহারই চিত্র।

তিনি স্ত্রীকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন এবং স্ত্রীর প্রতি একান্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন তাহা গীতগোবিন্দের মধ্য হইতে স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে ও পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কথাগুলিই তাহার প্রমাণ। বিশেষতঃ মানভঞ্জনের পরের পালায় বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে কথাটার যে অতি উপযুক্ত ও চমৎকার ব্যবহারই হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতিকে যেরূপ ভক্তি, সম্মান ও পূজা দিতে পারা যায় জয়দেবের চিত্তে বোধ হয় তদপেক্ষা আরও অধিক ছিল।

দুঃখকষ্টের জীবন অতিবাহিত না করিলে কেহ ভাল লেখক হইতে পারে না, কিন্তু ঘোরতর দুঃখ ও দৈন্যদশা কবিত্ব শক্তির বিনাশক। বোধ-হয় এপ্রকার ঘোরতর দুঃখ বা দৈন্যদশা জয়দেবের জীবনে ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার কবিত্বের সুর যেন একটী অমৃতময় সুখের উৎস। রাধিকার দুর্ব্বহ বিরহও যেন সুখেরই অমৃতমাখা মিষ্টতায় পরিপূর্ণ। কৃষ্ণেরও বিরহদুঃখের মধ্যে দুর্দ্দান্ত তপ্ত নিশ্বাস অনুভব হয় না, যেন তাহা দুঃখশূন্য কৃত্রিম রোদন।

জয়দেব অতি সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহারও প্রমাণ গীতগোবিন্দের

মধ্যে অনেক আছে। দাম্পত্য প্রেমের হাস্য রসিকতায় তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে হয় এবং তিনি প্রণয়িনীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। আজ এই সভ্যতার অনুশীলনের যুগেও মানভঞ্জন প্রভৃতিতে প্রেমিক প্রেমিকা তাঁহারই কথার পুনরুক্তি করিয়া থাকে।

গীতগোবিন্দের মধ্য হইতে আরও অনুমান করা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ তিনি যুবতী পত্নীকে ছাড়িয়া অনেক দিন প্রবাসে কাটাইয়া ছিলেন। বিরহিজনস্য দুরন্তে, পথিকবধূজনজনিতবিলাপে, নীয়ন্তে পথিকৈঃ প্রভৃতি শ্লোক সমূহের ভাব হইতে ইহা অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। তবে ইহা কেবল মাত্র কবির কল্পনাও হইতে পারে।

৪। বিভিন্ন পুস্তকে জয়দেবের জীবনী।

গীতগোবিন্দে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভিন্ন কতকগুলি প্রাচীন পুস্তকে জয়দেবের জীবনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল প্রাচীন পুস্তক সম্প্রদায় বিশেষভুক্ত লোকে সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিহাস বা প্রকৃত কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া জয়দেবের অমানুষিকতা ও তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনা সমূহের দিকে অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কিম্বদন্তী ও জনপ্রবাদ মাত্রই সে সকল জীবন চরিতে স্থান পাইয়াছে। এই সকল প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে ভক্তমালা ও জয়দেব চরিত্রই প্রধান। আমরা তিন খানি ভক্তমালার বিষয় অবগত আছি, চন্দ্রদত্তকৃত সংস্কৃত ভক্তমালাগ্রন্থ, নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল এবং লালদাস বা কৃষ্ণদাস কৃত বাঙ্গালা ভক্তমালগ্রন্থ। বর্ত্তমান পুস্তকে সংস্কৃত ভক্তমালাই আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হইল। বাঙ্গালা ভক্তমালা নাভাজীকৃত হিন্দীর অনুবাদ।

সংস্কৃত ভক্তমালায় জয়দেব সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে তাহা কেবলমাত্র

অলৌকিক ঘটনা সমূহেরই বিবৃতি মাত্র ; কিন্তু বনমালীদাস রচিত জয়দেব চরিত্রী অলৌলিক ঘটনার বর্ণনা হইলেও তাহার মধ্য হইতে কতকটা সত্য বাহির হইয়া পড়ে। উভয় পুস্তকই জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু জনপ্রবাদ যখন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হইয়া হইয়া অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছিল, ভক্তমালার লেখক সেই অবস্থায় উহা সংগ্রহ কয়িয়া থাকিবেন। জয়দেব চরিত্রীতে এ দোষ অনেকাংশে কম। উভয় পুস্তকেরই সারকথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

[ক] ভক্তমালা—

জগন্নাথের পুরীর প্রান্তে উৎকল দেশে বিন্দুবিল্ব নামে খ্যাত একটী ব্রাহ্মণ সংকুল গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বিদ্যাভ্যাস রত, শান্ত, পুরুষোত্তমের পূজক জয়দেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

কোন সময়ে একজন অনপত্য ব্রাহ্মণ জগন্নাথের নিকট আসিয়া অপত্য কামনা করিয়া মানসিক করিলেন যে পুত্র বা কন্যা প্রথমে যেটী জন্ম গ্রহণ করিবে তাহাকেই জগন্নাথের সেবায় অর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণের প্রথমে এক কন্যা তারপর কয়েকটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ অঙ্গীকার মত সপত্নীক পুরুষোত্তমের মানসিক শোধ করিবার জন্য পদ্মাবতী নাম্নী ঐ কন্যা জগন্নাথের নিকট লইয়া আসিলেন। জগন্নাথ উক্ত ব্রাহ্মণ এবং মন্দিরের পূজক উভয়কেই রাত্রে স্বপ্ন দিলেন যে কন্যা তাঁহারই গ্রহণ করা হইল পরন্তু ঐ কন্যা তাঁহারই প্রিয়পাত্র জয়দেবকে দেওয়া হউক। জয়দেব দীন হীন বেশে গ্রামসীমায় পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিরা সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলে তিনি উপযুক্ত পাত্র নহেন বলিয়া এবং স্বপ্ন বিবরণ বঞ্চনার কথা বলিয়া ঐ কন্যা লইতে অস্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ জগন্নাথের স্বপ্নদত্ত আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কন্যাকে বলিলেন, এই

ব্যক্তিই তোমার পতি, পতির আজ্ঞা পালনই নারীর ধর্ম্ম, এই বলিয়া কন্যাকে সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। জয়দেব প্রথমে কন্যাকে বলিলেন তোমার পিতা মাতা চলিয়া গেল, তুমিও যাও, বৃথা এখানে কেন থাকিবে? পদ্মাবতী উত্তর করিলেন পিতামাতা তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহাকেই পতি বলিয়া জানেন, আর কোথাও যাইবেন না। এইরূপ অবস্থায় ঐ কন্যাকে ত্যাগ করিলে পরম অধর্ম্মে পড়িবেন মনে করিয়া জয়দেব অনন্যোপায় হইয়া উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কন্যাকে লইয়া গিয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন ও তৎপরে তাঁহাকে নিজালয়ে আনিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দম্পতিদ্বয় এক প্রাণ হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং পুরুষোত্তমের সেবায় তৎপর হইয়া উভয়ে নৃত্য ও গীত দ্বারা প্রতিনিয়ত তাঁহার সেবা করিতে থাকিলেন।

একদা জয়দেব মনে করিলেন যে স্বয়ং গীত রচিত করিয়া হরিকে তুষ্ট করিবেন। এই স্থির করিয়া গীতগোবিন্দ নামক কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন এবং ঐ কবিতা নিজ পত্নীর 'সহিত নৃত্য করিয়া দেবাদিদেবের সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহাদের নিত্য কার্য্য ছিল।

একদিন রাস চরিতের মানভঞ্জন লিখিতে গিয়া শিরসিপদপল্লবং দেহি একথা মনে আসিলেও ঈশ্বরতা অনুচিন্তন করিয়া লেখনীতে আনিতে পারিলেন না, অন্যপদ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু মিলিল না, অগত্যা পদ অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। অবিলম্বে পুরুষোত্তম গৃহে আসিয়া ঐ পদ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় স্নান করিবারই মত বাহির হইয়া গেলেন। জয়দেব গৃহে আসিয়া পাদপূরণ ও অন্য হস্তের লেখা দেখিতে পাইলেন এবং পত্নীর নিকট সকল বিবরণ শুনিয়াও কিছু বুঝিতে না পারিয়া অশান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন; তখন

পুরুষোত্তম তাঁহাকে স্বপ্নে সকল কথা জানাইয়া দিলেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জয়দেব পত্নীকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলেন। তারপর জয়দেব গীতগোবিন্দ সমাপ্ত করিয়া পুরুষোত্তমকে তাহা নিবেদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন।

জয়দেব সম্বন্ধে সংস্কৃত ভক্তমালার পরিচয় কেবল এইটুকু। কিন্তু এই জীবন চরিত যে অতি অকিঞ্চিৎকর এবং ইহা যে একজন অজ্ঞ অপদার্থ উড়িয়া পাণ্ডা বা সেইরূপ কোন উড়িয়ার কল্পনা প্রসূত তাহা বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই ধারণা করিয়া লইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। উৎকলবাসীরা বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত গল্পই গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু জয়দেবকে নিজের দেশের লোক প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঐ গল্পের আকার এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে যে উহাতে জয়দেবের মহত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া দূরের কথা জয়দেবের ন্যায় পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তির অঙ্গে কুৎসার কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। একথা অন্যত্র বিবৃত হইবে।

উপরোক্ত জীবন চরিতের পর ভক্তমালায় জয়দেব সম্বন্ধে কয়েকটী অলৌকিক গল্প * আছে তাহা অলৌকিক কাহিনী অংশে উল্লিখিত হইবে। ভক্তমালায় সর্ব্বশেষে গঙ্গাস্নানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। জয়দেব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। জরাগ্রস্ত হইয়াও তিনি উৎকল হইতে (!) প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। উৎকলের রাজাও গঙ্গাস্নান করিতেন, কিন্তু শিবিকারোহণে। জয়দেব একদিন বসিতে বসিতে আসিতে আসিতে অতি কষ্টে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে পথিমধ্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে করিতে রাজা আসিয়া উপনীত হইলেন এবং পাল্কীতে উঠাইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। পরদিন রাজা

* উৎকল রাজের গ্রন্থ প্রণয়ন, শাকবিক্রয় কারিণীর নিকট জগন্নাথের গীতগোবিন্দ শুনা, দস্যু কর্ত্তৃক জয়দেবের হস্তপদ ছিন্ন হওয়া, পদ্মাবতীর মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন।

তাঁহাকে শিবিকা দিতে চাহিলেন কিন্তু জয়দেব বলিলেন পদব্রজে স্নান করাই তাঁহার ব্রত। সেই দিন রাত্রে সকল লোকেই স্বপ্ন দেখিল যে গঙ্গা আসিয়া তাহাদের বলিতেছেন যে জয়দেবের পুষ্করিণীতেই তিনি থাকিবেন। জয়দেব তাঁহার অতি প্রিয়, তাঁহার ব্রতভঙ্গ না হয় এই জন্য তিনিই বাপী মধ্যে আসিবেন এবং তাহার প্রত্যয় স্বরূপ লোকে পদ্মপুষ্প দেখিতে পাইবে। স্বপ্নকথা পরদিন প্রচারিত হইল, তখন রাজা, অমাত্যবর্গ, পুরোহিত, জয়দেব ও পদ্মাবতী সকলেই সেই বাপীতীরে গেলেন এবং গঙ্গা সেই বাপীতে প্রবেশ করিলেন, সকলে পদ্মপুষ্প দৃষ্টি গোচর করিল এবং জাহ্নবীর হিল্লোল ও সৈকতও প্রত্যক্ষ করিল।

[খ] জয়দেব চরিত্রী ঃ—

বাসস্থান, বিবাহ ও রাধামাধব স্থাপন।

দক্ষিণ দেশেতে একজন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কিছু ছিল না। তিনি পুরুষোত্তম গিয়া জগন্নাথের নিকট মানসিক করিলেন যদি পুত্রলাভ করেন তবে জগন্নাথের সেবক এবং কন্যালাভ করিলে সেবিকা করিয়া দিবেন। মানসিক করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে যথাকালে তাঁহার পত্নী গর্ভ ধারণ করিয়া এক অতি রূপবতী কন্যা প্রসব করিলেন। লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী দেখিয়া সাধ করিয়া ঐ কন্যার নাম পদ্মাবতী রাখা হইল।

কন্যা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার জন্য তাহাকে জগন্নাথের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। ব্রাহ্মণ আহারাদি করিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলে জগন্নাথ তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন যে তোমার কন্যা দেখিয়া আমি তুষ্ট হইলাম এবং ঐ কন্যা গ্রহণ করিলাম কিন্তু তোমাকে আমার একটী কথা রাখিতে হইবে। অজয় নদের উত্তরতীরে কেন্দুবিল্ব নামে

একটী গ্রাম আছে, উহা আমারই ধাম এবং পুরাতন তীর্থ কিন্তু কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই তীর্থের মহিমা প্রকাশের জন্য আমারই অংশে জয়দেব নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই পদ্মাবতী কন্যা লইয়া গিয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেই আমার সন্তোষ হইবে। স্বপ্ন কথা সকলকে বলা হইলে জগন্নাথের সেবকবর্গও ব্রাহ্মণকে সেই অনুমতি দিলেন।

ব্রাহ্মণ বিংশতি দিনে * কেন্দুবিল্ব আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানকার লোক জয়দেবের কি গোত্র, কাহার পুত্র ইত্যাদি কোন পরিচয় দিতে পারিল না, কেবল বলিল যে এক জন অনেক দিন হইতে এই গ্রামে আছে বটে, সে শিবের মণ্ডপে থাকে। ভিক্ষা মাগিয়া খায়, বাউলের প্রায় কাল কাটায়, কাহাকেও কিছু বলে না, নাচে, গায়, কাঁদে আর হরিনাম জপ করে। অজয়ের তীরে এক কদম্ব গাছের তলায় সেখানকার লোক ঐ ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া ধ্যানমগ্নভাবে অবস্থিত জয়দেবকে দেখাইল। ব্রাহ্মণ স্বপ্নদৃষ্ট জয়দেবের সঙ্গে মূর্ত্তির মিল করিয়া দেখিলেন, অবিকল একরূপই দেখা গেল।

স্বপ্নকথা জয়দেবকে বলা হইলে জয়দেব বলিলেন যে জগন্নাথদেব যদি আমাকেও স্বপ্নে ঐ আজ্ঞা করেন তবেই কন্যা লইতে পারি নচেৎ রমণীতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। রাত্রে জয়দেব স্বপ্নযোগে জগন্নাথের আজ্ঞা পাইলেন এবং কন্যা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু স্বপ্নযোগেই তিনি জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে আমার দুইটী সাধ আছে তাহা পূরণ করিতে হইবে। প্রথম সাধ, আমি এক-খানি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিব এবং দ্বিতীয় সাধ, রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি

* কেঁদুলি হইতে হাঁটা পথে পুরী সম্ভবতঃ তিন শত মাইলের কিছু বেশী ছিল। সুতরাং প্রত্যহ গড়ে ১৫।১৬ মাইল চলিলে ২০ দিনই লাগে।

স্থাপনা করিয়া তাহার সেবা করিব। জগন্নাথ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং বলিলেন বহুপূর্ব্বে এই কেন্দুবিল্ব আমারই মহাতীর্থ ছিল, এখন যদিও বিলুপ্ত হইয়াছে তত্রাপি এখানে এখনও যুগলমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন, তুমি কদম্ব খণ্ডির ঘাট অন্বেষণ কর, একহাঁটু জল মধ্যেই সেই মূর্ত্তি পাইবে।

পরদিন স্বপ্ন কথা প্রকাশ হইল। গ্রামের সমস্ত লোক মহাসমারোহে সেই ঠাকুর আনিতে গেল। জয়দেব কদম্ব খণ্ডির ঘাট হইতে সিংহাসন বিরাজিত দুই মূর্ত্তি পৌষ সংক্রান্তির সূর্য্যাস্তের সময় মাথায় করিয়া উঠাইলেন। মহা সমারোহ হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ বেদ মন্ত্রে অভিষেক করিয়া সেই যুগল মূর্ত্তির রাধামাধব নাম করণ করিলেন।

এই ঘটনা শুনিয়া বর্দ্ধমানের রাজা (?) সেখানে আসিলেন এবং জয়দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলেন। তারপর তিনি বহুলোক লাগাইয়া এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গোদা পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে রাধামাধবের পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া বিধিমত সম্পূর্ণ সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

পদ্মাবতীর পিতা ততদিন সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাধামাধবের মূর্ত্তি স্থাপনা হইলে জয়দেবের বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ফাল্গুন মাসের শেষে শুভদিন স্থির হইল। চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান সমারোহের জন্য স্থিরীকৃত হইয়া নানাবিধ দেশ বিদেশের বাদ্যভাণ্ড, নট নর্ত্তকী ভাঁড়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিবিধজাতি, রাজা রাজড়া প্রভৃতি বিপুল আয়োজনে সমবেত হইয়া পড়িল। এমন সমারোহ বড় একজন রাজপুত্রের বিবাহেও হয় না; এমন কি অমরাপুরী হইতে তেত্রিশ কোটী দেবতা ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বিবাহ সভায় আসিলেন। বাজী, বাজনা, কারখানা, হাতী ঘোড়া ও যত প্রকার সজ্জা ও সমা-

রোহ হইতে পারে তাহাতে গ্রামপূর্ণ হইয়া গেল। এবং সম্পূর্ণ দেশাচার, লোকাচার ও শাস্ত্রাচার মতে বিবাহ সম্পন্ন হইল। তারপর যথাযোগ্য সকলকে বিদায় করিয়া বর্দ্ধমানের রাজা (?)* স্বয়ং বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

তীর্থের সূচনা—গীতগোবিন্দ রচনা ও কদম্ব খণ্ডিতে গঙ্গা।

জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে অতি আনন্দে সংসারসুখভোগ করিতে থাকিলেন। রাধামাধবের জন্য পুষ্পহার রচনা, ঠাকুরের সেবা এবং রন্ধনাদিতে পদ্মাবতী কাল কাটান ; জয়দেব পূজার্চ্চনা করেন, প্রাতে এক প্রহর গীতগোবিন্দ লিখিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ খাইয়া পুনরায় লিখিতে বসেন। বৈকালে ও রাত্রে বিধিমত পুনরায় ঠাকুরের সেবা করিয়া রাত্রিকালে হরিনাম গান করেন।

এইভাবে পূজা ও নিত্য কর্ম্মের অবসরকালে গীতগোবিন্দ রচনা করিতে করিতে মানভঞ্জন গীতের স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং পর্য্যন্ত লিখিয়া ঈশ্বরের মাথায় পাদপদ্ম দেওয়ার কথা আর লিখিতে পরিলেন না। অনেক চিন্তা করিয়া যোজনার বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতে করিতে পুস্তক বাঁধিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন।

গঙ্গাজলে নামিয়া তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। দৈববাণী বলিতে লাগিল, জয়দেব, আসিতে যাইতে এত দূর পথ † তুমি বড় কষ্ট

* এই রাজা লক্ষ্মণসেন কিনা তাহা অবশ্য অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ইনি বর্দ্ধমানের নামে চলিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মণসেনের সময় বা চৈতন্য দেবের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সময় জয়দেব যে সময়েই জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহার সময়ে বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই ইতিহাসে দেখা যায়।

† কেন্দুলি হইতে গঙ্গাতীর ১৮ ক্রোশ।

পাও এবং তোমার জন্য আমিও বড় উদ্বেগ ভোগ করি, সুতরাং কাল হইতে তুমি আর এত দূর আসিও না আমি স্বয়ং তোমার জন্য অজয়ে উজান যাইব। কালি হইতে তুমি কেন্দুবিল্বের দক্ষিণে কদম্ব খণ্ডির ঘাটে স্নান করিও, আমি প্রত্যহই তোমার জন্য সেখানে যাইব। দৈববাণী শুনিয়া প্রত্যক্ষ দেখা পাইবার জন্য জয়দেব গঙ্গার স্তব স্তুতি করিতে গঙ্গা অতি অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিতে জয়দেবকে দেখা দিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসার্থ বলিলেন যে পৌষমাস সংক্রান্তির দিন সূর্য্যোদয় সময়ে শঙ্খশোভিত দুই বাহু তোমাকে নিশ্চয়ই দেখাইতে থাকিব। তুমি জগন্নাথের অংশ, তুমি মহাপুরুষ, কদম্বখণ্ডিকে তুমি মহাতীর্থরূপে পরিগণিত করিয়া যাইবে। পৌষ সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি ঐখানে স্নান করিবে তাহার কোটী জন্মের পাপ নষ্ট হইবে আর যে কদম্ব খণ্ডির ধুলা মাখিবে ও খাইবে তাহার পুণ্যের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। ঈশ্বরের তীর্থ পুনরায় তোমা কর্ত্তৃকই উজ্জ্বল হইবে, তুমি মহাপুরুষ, তুমি ধন্য, অদ্য স্বয়ংকৃষ্ণ তোমার গৃহে ভোজন করিতেছেন। এই বলিয়া গঙ্গা অদৃশ্য হইলেন।

জয়দেব যখন স্নান করিতে গিয়াছেন ইত্যবসরে ভগবান জয়দেবের মূর্ত্তিতে তাঁহার গৃহে আসিলেন এবং স্নান করিয়া জয়দেব প্রত্যহ যেভাবে আসিয়া থাকেন সেইভাবে পদ্মাবতীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পদ্মাবতী পাদপ্রক্ষালন করাইয়া কেশে করিয়া পা মুছাইয়া পট্টবস্ত্র পরিতে দিলেন এবং স্বামীরূপী ভগবান আসন পরিগ্রহ করিলে প্রাত্যহিক নিয়ম মত তাঁহাকে চন্দন মাখাইয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। জয়দেব-রূপী ভগবান রাধামাধবকে তখন স্নান করাইয়া তাঁহার পূজা সমাপ্ত করিলেন। পদ্মাবতী রন্ধন করিয়া নানাবিধ ভোগের দ্রব্য রত্নথালা ভরিয়া আনিয়া দিলে তিনি ঐ ভোগ রাধামাধবকে উৎসর্গ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে পুস্তক খুলিয়া দেহি পদপল্লব

মুদারং অংশ লিখিয়া দিয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। পদ্মাবতী স্বামীর প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভোজন করিতেছেন এমন সময় প্রকৃত জয়দেব স্নান করিয়া আসিয়া উপনীত হইলেন। পদ্মাবতীর এবম্ভূত ব্যবহার দেখিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া প্রথমে ক্রুদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু সকল বিবরণ পদ্মাবতীর নিকট শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন পদ্মাবতীর কথা নিশ্চয়ই সত্য, কারণ পদ্মাবতীর ন্যায় নারী স্বামীর অগ্রে ভোজন করিবে এরূপ কুৎসিৎ কর্ম্ম করিতেই পারে না। এমন কি, গঙ্গাও অন্তর্দ্ধান হইবার সময় বলিয়াছেন, কৃষ্ণ তোমার গৃহে অন্ন ভোজন করিতেছেন। আচ্ছা, পদ্মাবতী যখন বলিতেছে গ্রন্থ লইয়া তিনি গ্রন্থও লিখিয়াছেন তখন গ্রন্থই দেখি, বলিয়া গ্রন্থ খুলিলেন এবং দেখিতে পাইলেন লেখা রহিয়াছে "দেহিপদপল্লবমুদারং"—যাহা তাঁহার মনে আসিয়াছিল লেখনীতে আনিতে পারেন নাই, তাহাই পূরণ হইয়া রহিয়াছে। তখন আর সন্দেহ রহিল না। শয়নমন্দির মধ্যে গেলেন, সেখানে কৃষ্ণ অঙ্গের পরিমল এবং শয্যার উপর চিহ্ন সমূহ দেখিয়া জয়দেব ভক্তিতে নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীকে বলিলেন তুমিই ভাগ্যবতী, সংসারময় তোমার মহিমা আমি ঘোষণা করিব।* এই বলিয়া পদ্মাবতীর থালে এক সঙ্গেই সেই প্রসাদান্ন খাইতে লাগিলেন।

* জয়দেব পদ্মাবতীর মহিমা জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে মহিমা আজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী মলিন করিয়া দিল।

তীর্থ প্রকাশ-মেলার স্থাপনা।

এই দুইটী কথা—স্বয়ং গঙ্গা ও স্বয়ং ভগবান জয়দেবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন—উভয়ে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। পৌষ সংক্রান্তির দিন কদম্ব খণ্ডির ঘাটে গঙ্গা আসিবেন * এবং শঙ্খশোভিত হাত মনুষ্যকে দেখাইবেন একথা এক এক করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইল। সংক্রান্তি নিকটবর্ত্তী হইলে চতুর্দ্দিক হইতে লোক জমিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ জনসঙ্ঘে কেন্দুবিল্ব ভরিয়া গেল। চতুঃসীমা হইতে চারি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবের দল, সাধু সন্ন্যাসী, মহান্ত গোঁসাই, সর্ব্ববিধ জাতি, গৃহী যতি ও চারিবর্ণ সকলেই সমবেত হইয়া পড়িল। পদাবলীকীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন ও মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। জাতি ও পঙ্‌ক্তি বিচার না করিয়া চারিবর্ণ ও সর্ব্বাশ্রম একত্রিত হইয়া জগন্নাথ তীর্থেরই ন্যায় এখানে প্রসাদান্ন বিতরিত হইতে লাগিল। এই অজয়ের তীরে জয়দেবের লীলাক্ষেত্রে সকল মানুষ এক হইয়া গিয়া কৃষ্ণ ও রাধারই ভজনা গাহিতে লাগিল।

যে স্থানে ভগবান স্বয়ং আসিয়া পুঁথিতে লিখিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর বৎসরের শেষ দিনে, অক্ষয় পুণ্যলাভ করিবার জন্য যেদিন সকলে মকর স্নান করে, গঙ্গা যেখানে স্বয়ং আসিয়া শঙ্খশোভিত হস্ত মনুষ্যকে দেখাইবেন সেই স্থান পরম পবিত্র তীর্থরূপে প্রথম মহোৎসবেই প্রচারিত হইয়া গেল।

* অজয়ের সহিত গঙ্গার সংযোগ থাকাতে এবং সঙ্গমস্থল কেন্দুবিল্ব হইতে খুব বহুদূর না হওরায় অজয় স্নানেই যে গঙ্গার মাহাত্ম্য পাওয়া যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যই বোধ হয় এখানে প্রচ্ছন্ন আছে।

সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের সময় গঙ্গা অঙ্গীকার মত সকলকে দর্শন দিলেন। সকলে শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজাইয়া বেদমন্ত্রে গঙ্গার আবাহন করিল। তিন দিন মহোৎসব হইল। চতুর্থ দিবসে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া সংকীর্ত্তনের দল লক্ষ লক্ষ লোক সহ রাধামাধবের নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সেই লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে সেই বিরাট সভায় জয়দেব সকলকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিলেন, শুন ভাই সব, কোন্ যুগে কতকাল পূর্ব্বে এই স্থান ঈশ্বরেরই ধাম ছিল, আজ সেই লুপ্ত তীর্থ পুনরায় মহাতীর্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইল। যে কদম্ব খণ্ডিতে * রাধামাধবের প্রকাশ হইয়াছে, যে কদম্ব খণ্ডিতে গঙ্গা স্বয়ং মানুষকে দেখা দিলেন, বৎসর বৎসর সেই কদম্ব খণ্ডিতে এই মহামেলা বসিবে। বৎসর বৎসরই গঙ্গা সেখানে আবির্ভূত হইবেন। যে ব্যক্তি এই কদম্ব খণ্ডিতে ঐ দিন স্নান করিবে, তাহার ধুলা মাখিবে, গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে, রাধামাধব দর্শন করিবে, সাধ্যমত দানধ্যান করিবে, তাহার পুণ্য ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ও তাহার ইহকাল এবং পরকাল সুখে অতিবাহিত হইবে। তারপর সমবেত জনমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া জয়দেব বলিলেন, ভাইসব, তোমরা সকলে কৃপা করিয়া আপনাদিগের পরমার্থের জন্য প্রতি বৎসর এই সংক্রান্তিতে সকলে সমবেত হইবে। সভাভঙ্গ হইল।

মেলার অবসানে লোকসঙ্ঘ দিগ্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল এবং জয়দেবের এবম্ভূত ক্ষমতা ও তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি স্বয়ং নারায়ণস্বরূপ ও পদ্মাবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী সকলে এই বার্ত্তা

---

* গোবর্দ্ধনের নিকট এক কদম্বখণ্ডির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেই খানে কৃষ্ণ রাধিকার সহিত পাশা খেলিয়াছিলেন।

বহন করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া গেল। বৎসর বৎসর মেলার লোক-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং কেন্দুবিল্বের মাহাত্ম্য চতুঃসীমায় ঘোষিত হইয়া গেল।

শেষ জীবন।

মেলার স্থাপনা করিয়া পদ্মাবতী ও জয়দেব বহুদিন কেন্দুবিল্বে বাস করিলেন, তারপর উভয়ের বৃন্দাবনে যাইতে বাসনা হইল। তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহ রাধামাধবকেও লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল কিন্তু কি করিয়া সেই ভার বহন করিয়া লইয়া যাইবেন স্থির করিতে পারেন না তখন রাধামাধব স্বপ্ন দিলেন যে তিনি শালগ্রামরূপ ধারণ করিয়া খুঙ্গীর মধ্যে যাইবেন। প্রাতে উঠিয়া ঠাকুরঘরে গিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই রাধা-মাধব শালগ্রামরূপ ধারণ করিয়াছেন। তখন রাধামাধবকে লইয়া জয়দেব বৃন্দাবন গমন করিলেন। পদ্মাবতী ও পদ্মাবতীর জন্য একজন দাসীকেও সঙ্গে লইলেন। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ জয়দেবকে এতই ভক্তি করিত ও ভালবাসিত যে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিল না এবং কাঁদিতে লাগিল। তিনি তাহাদের প্রবোধ দিলেন যে সংক্রান্তির মহোৎসবের দিনে তাঁহারা উভয়ে সকলকে দেখা দিতে থাকিবেন।

বৃন্দাবনে গিয়া জয়দেব রাধামাধবের ও নিজের জন্য বৃন্দাবনের পশ্চিমে যমুনার তীরে কুঞ্জ, মন্দির ও অতিথিশালা আদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন পদ্মাবতী বৈজয়ন্তী মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে দিতে গেলে এমন সুন্দর মালা শালগ্রামের যোগ্য নহে দেখিয়া রাধামাধবের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন; যে রাধামাধবকে কত এমন মালা পরাইয়াছি সেই

রাধামাধব হইলেই এ মালা মানাইত। জয়দেব ও পদ্মাবতীর দুঃখ দেখিয়া পরদিন শালগ্রাম ঠাকুর কেন্দুলির সেই সুশোভন রাধামাধবরূপ ধারণ করিলেন। মনের সুখে তখন উভয়ে মালা পরাইয়া তৃপ্ত হইতে থাকিলেন। ব্রজবাসীরা সকলে এই সকল বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। বৃন্দাবনেও জয়দেব ভগবানের মহিমায় সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। সেখানেও মহোৎসব ও সংকীর্ত্তনাদি হইতে আরম্ভ হইল। এই ভাবে জয়দেব ও পদ্মাবতীর জীবনে বৃন্দাবনে দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

জয়দেব চরিত্রীর লিখিত বৃত্তান্ত এই স্থানে সমাপ্ত হইল। ভক্তমালার পার্শ্বে এই জীবন চরিত যে কতই আবর্জ্জনাবর্জ্জিত ও উৎকৃষ্ট তাহা সকল পাঠকই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিম্বদন্তীমূলক হইলেও ভক্তমালা অপেক্ষা এই পুস্তকে জীবন চরিতের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এই জীবন চরিতের লেখক প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। যখন বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সাধুদের কার্য্যকলাপ ও জীবন চরিত খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ সেই সময়ে মলিনতাবর্জ্জিত খাঁটি জনপ্রবাদ বা কোন লিখিত আখ্যায়িকা হইতে এই জীবন চরিত সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।

অন্যান্য সকল বিষয় পরিহার করিলেও এই জীবন চরিত হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

জয়দেব কেন্দুবিল্বে রাধামাধবের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন ও শাস্ত্র-মতে বিবাহ করিয়া সেই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সেখানে মেলার সৃষ্টি করিয়া চারিবর্ণ একত্রিত করিবার জন্য বহুদূর হইতে জন-মণ্ডলীকে আহূত করিয়াছিলেন।

কোন একজন বড় রাজা (তিনি বর্দ্ধমানের রাজা নহেন বলিয়াই

বোধ হয় কারণ বর্দ্ধমানের অস্তিত্বই জয়দেবের সময়ে ছিল না) বিগ্রহ স্থাপন ও বিবাহ সম্বন্ধে জয়দেবকে সহায়তা করিয়াছিলেন।

জয়দেব ও পদ্মাবতী শেষ বয়সে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।

৫। অলৌকিক গল্প ও কিম্বদন্তী।

জয়দেব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেকগুলি অলৌকিক গল্প তাঁহার জীবন চরিতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, আমি শ্রেণী বিভাগ করিয়া নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিলাম।

(ক) গীতগোবিন্দের মাহাত্ম্য প্রকাশক ঃ—

১। উৎকল রাজের গীতগোবিন্দেরই ন্যায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন।

গীতগোবিন্দ জগন্নাথের মন্দিরে প্রত্যহ গীত হইত। উৎকলের কোন রাজা (ভক্তমালার মতে জয়দেব যখন জগন্নাথের পূজক ছিলেন তখন ইনিও উৎকলের রাজা ছিলেন) স্বয়ং যশোলিপ্সু হইয়া একখানি ঐরূপ কাব্য লিখিলেন এবং রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিলেন তাঁহার প্রণীত গীত ভিন্ন জয়দেব গীতি কেহ গান করিতে পাইবে না, করিলে দণ্ডার্হ হইবে। রাজাজ্ঞা পালন হইতে লাগিল; কিন্তু একদিন রাজা মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন জয়দেবপূজারী স্বপ্রণীত গীতগোবিন্দ গান করিতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জয়দের বলিলেন যে তাঁহার রচিত গীত ভিন্ন অন্য কোন গীতে মহাপ্রভু তুষ্ট হন না। এই বিষয়ের পরীক্ষার জন্য রাজাও অন্যান্য পূজকগণ মন্দির মধ্যে দুই খানা পুস্তক পাশাপাশি রাখিয়া প্রার্থনা করিলেন যে যে পুস্তক জগন্নাথের অধিক প্রিয় সেই খানই যেন উপরে এবং অপর খানা নিম্নে থাকে। দ্বাররুদ্ধ হইল এবং কিছু কাল পরে দ্বার খুলিলে দেখা গেল যে জয়দেবের পুস্তকই উপরে রহিয়াছে। সংস্কৃত ভক্তমালায় গল্পটী এইরূপ আছে।

গল্পটীর রূপান্তর এই যে শ্রীক্ষেত্রের কোন রাজা "গোবিন্দ মঙ্গল" নামক কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া উপরোক্ত আদেশ বা গর্ব্ব করিয়াছিলেন। পাণ্ডারা জগন্নাথের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সন্ধ্যার সময় উভয় পুস্তক মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিল। পর দিন দ্বার খুলিলে দেখা গেল গীতগোবিন্দ জগন্নাথের বক্ষে ও গোবিন্দ মঙ্গল পদতলে নিক্ষিপ্ত আছে। বাঙ্গলা ভক্তমালায় আর একটু অতিরিক্ত কথা আছে। রাজার রচিত গ্রন্থ জগন্নাথ গ্রহণ না করায় অভিমানে রাজা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন। জগন্নাথ দেখিলেন যে একজন ভক্ত ডুবিয়া মরিতেছে, তখন বলিলেন গীতগোবিন্দের যে দ্বাদশ সর্গ আছে তাহার অগ্রে তোমার রচিত বারটী শ্লোক থাকিবে *। রাজা ইহাতে আর আত্মহত্যা করিলেন না।

কোন উৎকল পুস্তকে এই দ্বাদশ শ্লোক আমি এখনও দেখিতে পাই নাই।

এ গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায় সে দেশের রাজার চেষ্টায় সম্ভবতঃ কোন পুস্তক গীতগোবিন্দের অনুকরণে প্রণীত হইয়াছিল কিন্তু জয়দেবের পুস্তকের পার্শ্বে তাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যে অনুগ্রহপ্রার্থী স্বদেশী একজন গরীব পূজারীর কীর্ত্তি নাশের জন্য রাজার চেষ্টা হইতে পারে না কিন্তু বিদেশীয় পুস্তক জগন্নাথের

*রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল।
নামের তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥
জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তবকৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥

মন্দিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে সে কীর্ত্তি ভাঙ্গিবার চেষ্টা স্বতঃই হওয়া সম্ভব।

২। শাকবিক্রয়িণী। ভক্তমালার আর একটী গল্প এই যে পুরীর নিকট কোন নগরে একজন স্ত্রীলোক বাস করিত; সে শাক, বেগুণ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। জগন্নাথের গীতগোবিন্দের গান শুনিবার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে যেখানেই ঐ গান হইত সেইখানেই তিনি ছুটিয়া যাইতেন। ঐ স্ত্রীলোক বেগুণ তোলে, আর গান গাহে, জগন্নাথও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গান শুনিয়া শুনিয়া চলেন, তাহাতে তাঁহার বসনে ও গায়ে বেগুনের কাঁটা লাগিয়া গিয়াছিল তত্রাপি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। পাণ্ডারা দেখিল ঠাকুরের গায়ে বেগুণের কাঁটা ও আঁচড় লাগিয়া আছে। তখন ধরণা দিয়া স্বপ্নে ঠাকুরের নিকট হইতে সব কথা জানিতে পারিল এবং ঐ স্ত্রীলোককে পালকী করিয়া আনাইয়া * রাজার নিকট লইয়া গিয়া তাহার মাসোহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিল। জয়দেবের সৌভাগ্য কথা বিস্তৃত হইল এবং রাজা স্বয়ং তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন।

৩। যবনের গীতগোবিন্দ গান। জগন্নাথ হাটে, মাঠে, পথে, অপবিত্র স্থানে যেখানে গীতগোবিন্দ গান হইত সেইখানে স্থান বিচার না করিয়া ছুটিয়া যাইতেন। রাজা ও পাণ্ডারা ভাবিলেন এও ত বড় মুস্কিল হইল, তখন ঘোষণা করিলেন যে কুৎসিত স্থানে বা রাস্তা চলিবার সময় যে গীতগোবিন্দ গাহিবে সে দণ্ডনীয় হইবে। একজন মোগল সে কথা না

* বাঙ্গলা ভক্তমালায় আছে তাহাকে আনাইয়া জগন্নাথকে প্রাণ ভরিয়া গীত শুনানও হইল। অধিকন্তু লেখা আছে:—

অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে।
শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে॥

মানিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পথে চলিতে চলিতে গীতগোবিন্দ গান করিতেছিলেন জগন্নাথও পাছু ধরিলেন। যবন প্রথমে সন্দিগ্ধ হইয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না কিন্তু পরে সুন্দর শ্যামল মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই গল্প হইতে বোধ হয় যে উড়িষ্যার লোকে গীতগোবিন্দকে এতই মিষ্ট বোধ করিয়াছিল যে যবন চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতি কর্ত্তৃক ও কুৎসিত এবং অপবিত্র সমাগম স্থলেও ইহা গীত হইত। রাজাকে তজ্জন্য হয়ত আইনও করিতে হইয়াছিল। এটী বাঙ্গলা ভক্তমাল গ্রন্থের গল্প।

যে গীতগোবিন্দ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত তাহার মহিমা প্রচারের জন্য এ সকল গল্পের সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(খ) জয়দেবের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ প্রকাশক ঃ—

১। বেড়ার বাঁধন ফুঁড়িয়া দেওয়া।

গল্প এই যে জয়দেব রাধামাধব বিগ্রহ সহ একটী কুটীরে পদ্মাবতীকে লইয়া বাস করিতেন। সেই কুটীরের বেড়া পুরাতন হওয়ায় দরিদ্র জয়দেব একদিন তাহা স্বয়ং বাঁধিতে ছিলেন। বাঁধন পার করিয়া দিবার লোক না থাকায় একবার ভিতরে আসিয়া ও একবার বাহিরে গিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইতেছিল। জয়দেব একবার বাহিরে গিয়াছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর, আমি বাপের বাড়ীতে থাকার সময় বেড়া বাঁধিতে জানিতাম আমি গিয়া পার করিয়া দিতেছি, আপনি বাঁধুন। পদ্মাবতী পার করিয়া দিতেছেন মনে করিয়া জয়দেব বাঁধিতে লাগিলেন। সমাপ্ত হইলেই দেখিলেন পদ্মাবতী পূর্ব্বে কোথায় গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাধামাধবের গায়ে ঘরের কালি ও ঝুল লাগিয়া রহিয়াছে।

২। চম্পাপুষ্প।

নবদ্বীপে থাকিবার সময় একদা জয়দেব চম্পাপুষ্প দ্বারা কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তখন ভগবানের গৌরমূর্ত্তি তিনি দেখিতে পান। ভাবী গৌরাঙ্গের রূপই তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইয়াছিল। যে স্থানে তিনি এইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার নাম চম্পাহট্ট। ভক্তি রত্না-করে এই গল্পটী আছে।

৩। কদম্ব খণ্ডিতে গঙ্গার আগমন—জয়দেব চরিত্রীর গল্প দ্রষ্টব্য।

৪। কৃষ্ণের পদপল্লবমুদারং লেখা—ঐ এবং ভক্তমালা।

৫। কেন্দুলিতে ও বৃন্দাবনে রাধামাধবের রূপ পরিবর্ত্তন—জয়দেব চরিত্রীর গল্প দ্রষ্টব্য।

(গ) পদ্মাবতীর পতিভক্তি প্রকাশক :—

১। পদ্মাবতীর মৃত্যু ও পুনর্জীবন।

ভক্তমালার আর একটী গল্প। পদ্মাবতী উৎকল রাজার অন্তঃপুরে যাইতেন এবং রাজমহিষীও তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। একদা রাজার একজন সম্পর্কীয় ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় রাজা জয়দেব প্রভৃতির সহিত শ্মশানে গিয়াছিলেন। মৃত ব্যক্তির পত্নী সতীসজ্জা করিতেছিল, তখন রাণী পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সতী বা সহমরণ দেখিতে যাইবেন কি?

একথায় পদ্মাবতী রাণীকে বলিলেন, সে আবার কি রকম সতী? স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র যে মরিল না, সাজসজ্জা করিয়া যাহাকে পুড়িতে হইবে সে আবার সতী কিরূপ বুঝিতে পারি না।

রাণীর একথায় বড় রাগ হইল, মনে মনে বলিলেন আচ্ছা, তুইই বা কেমন সতী একদিন পরীক্ষা করিব। কোন সময়ে জয়দেব রাজার সহিত জগন্নাথ দর্শনে গিয়া একরাত্রি আসেন নাই। এই সুযোগে

রাণী পদ্মাবতীকে প্রাতে ডাকাইয়া কৃত্রিম রোদন করিতে লাগিলেন, যে হায় হায়, বিনা ব্যাধিতে জয়দেব অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, রাজাও সেইজন্য বাড়ী আসেন নাই !

তাহা শুনিয়া অ্যাঁ কি হইয়াছে বলিয়া ক্ষণমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই পদ্মাবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। রাণী তখন নিজের দুর্ব্বুদ্ধি দেখিতে পাইয়া ভয়ার্ত্তা হইয়া হায় হায় ও রোদন করিতে লাগিলেন এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য সকলেও বিপন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময় রাজা জয়দেবের সহিত আসিয়া উপনীত হইলেন। রাণী মৃত্যু সম্বন্ধে কোন বিষয় গোপন না করিয়া প্রকৃত কথা জ্ঞাত করিলেন। রাজা মর্ম্মাহত হইলেন ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার ন্যায় রাণী না থাকাই ভাল, তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম,—যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। জয়দেব রাণীর পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজার নিকটে বিনয় বাক্যে বলিলেন ইঁহার দোষ কি, কৌতুক করিয়াই ইনি এরূপ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, যা হবার হইয়াছে, আপনারা জগন্নাথের স্মরণ করুন, আমিও একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, ভগবান অবশ্যই কল্যাণ করিবেন। এই বলিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া জয়দেব "প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্" গান ধরিলেন, তখন পদ্মাবতী নড়িতে লাগিলেন, তারপর একে একে উঠিয়া বসিয়া জয়দেবের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া ঐ মানভঞ্জনের গান গাহিতে লাগিলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, রাণী পদ্মাবতীর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও পূজাদি করিলে উভয়ে গৃহে গমন করিলেন।

অশিক্ষিত উড়িয়া পাণ্ডা ভিন্ন এ প্রকার অসাড় গল্পের সৃষ্টি অন্য কেহ করিতে পারে না। পতির মৃত্যু সংবাদে সতীর মূর্চ্ছা বা মৃত্যু একান্তই সম্ভব, কিন্তু পাগল না হইলে কোন পতি বাদ্যভাণ্ড করিয়া

এ অবস্থায় মানভঙ্গনের গান ধরে না। গল্পের শেষ অংশটা অতি অকিঞ্চিৎকর।

(ঘ) পরোপকার, জীবনের মহত্ত্ব ও ক্ষমাগুণ প্রকাশক :—

১। দস্যুর আক্রমণ।

একদা নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া জয়দেব কোন গ্রামে গিয়াছিলেন, * সেখান হইতে প্রাপ্ত সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি সহ বন মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে চারি জন দস্যু তাঁহার সঙ্গ লইল এবং তাঁহার প্রাপ্ত দ্রব্য জোর পূর্ব্বক লইয়া হস্ত পদ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বন মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া গেল।

রাজা সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিয়া জয়দেবকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে গৃহে লইয়া গেলেন এবং পদ্মাবতীকে আনাইয়া চিকিৎসা দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সেই দস্যুগণ কোন সময়ে জয়দেবের অবস্থা দেখিবার জন্য মালা তিলকাদি ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে জয়দেবের গৃহে আসিলে জয়দেব তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াও পদ্মাবতীকে দিয়া পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনিয়া দেওয়াইলেন, পরম যত্নে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন এবং রাজাকে গৃহে আহ্বান করিয়া রাজার নিকট যাচ্ঞা করিয়া নানাবিধ ধনরত্নাদি তাহাদিগকে দেওয়াইলেন এবং দুর্গম বনমধ্যস্থ পথ পার হইবার জন্য তাহাদিগের সঙ্গে পাঁচ ছয়জন ভৃত্যও দেওয়াইলেন।

---

* বাঙ্গালা ভক্তমালায় আছে যে ঠাকুরসেবার জন্য অর্থ আনিতে বিদেশে গিয়াছিলেন। অর্থ লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দস্যুতে আক্রমণ করিয়া সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছিল এবং হাত পা কাটিয়া কূপ মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল।

ভৃত্যগণ তাহাদিগের সঙ্গে কিছু দূর গিয়া কৌতূহলী হইয়া দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, জয়দেব আপনাদিগের জন্য এত করিলেন তিনি আপনাদিগের কে? দস্যুগণ বলিল, শুনিবে? আমরা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, কোন সময়ে আমরা কর্ণাটের রাজার নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় এই জয়দেবও ভিক্ষার্থে সেদেশে গিয়াছিল কিন্তু তাহার ব্যবসা চুরি করা, রাত্রে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চুরি করিয়া ধরা পড়ে এবং রাজসভায় নীত হয়। রাজা এই জয়দেবকে চণ্ডালগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহার শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু আমরাই ইহার প্রাণ বাঁচাই। চণ্ডালদের অর্থাদিদ্বারা বশ করিলে তাহারা ইহার হস্ত পদাদি মাত্র ছিন্ন করিয়া রাজার প্রত্যয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রাণবধ হইতে এ ব্যক্তি রক্ষা পায়। সেই প্রাণ প্রাপ্তিরূপ উপকার স্মরণ করিয়াই এ আমাদিগকে এমন ভক্তি করিল ও অর্থ দেওয়াইল।

এই মুহূর্ত্তে আকাশে ঘোরতর ধ্বনি উঠিয়া ঐ পাপিষ্ঠদিগের মাথায় বজ্রপাত হইল*।

ভৃত্যগণ এই সকল ব্যাপার শুনিয়া ও দেখিয়া রাজার নিকট আসিয়া সমস্ত বিবৃত করিল। সেই পাপিষ্ঠদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া জয়দেব মাটীতে তাঁহার ছিন্ন হাত পা আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ও পদাদি পুনরায় পূর্ব্বেরই ন্যায় সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া গেল।

রাজা জয়দেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জয়দেব আনুপূর্ব্বিক সকল কথা রাজাকে শুনাইলেন।

* * * *

যে সকল অলৌকিক গল্প এই পুস্তকে সংগ্রহ করা হইল দেশ ও রচয়িতৃ বিশেষে সেগুলি কোথাও কোথাও অল্পাধিক রূপান্তরিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* কোন কোন মতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিলেন।

৬। কিম্বদন্তী ও সত্যের শৃঙ্খলা।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে জয়দেবের যেটুকু জীবনী প্রাপ্ত হইলাম তাহা সাধারণতঃ অলৌকিক ঘটনার আবরণে জড়িত এবং কিম্বদন্তীমূলক ও শৃঙ্খলাশূন্য। সুতরাং এ প্রকার ক্ষেত্রে জীবন-চরিত সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত করা নিতান্ত সাহসিকতা ভিন্ন কিছুই নহে এবং ব্যক্ত করিলেও সকল লোকের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইবার আশা কম। তত্রাপি অনুসন্ধানের চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছি বলিয়া যেটুকু সত্যের ছায়া গীত-গোবিন্দে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার সহিত অসংলগ্ন ভাবে প্রাপ্ত বিবরণ সমূহকে একত্রিত করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে একটা শৃঙ্খলাসন্নিবিষ্ট জীবনী পাঠক মহাশয়দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারা যায়।

জয়দেবের জন্মস্থান, বর্ত্তমান বীরভূম জেলার সর্ব্বদক্ষিণ সীমায় অবস্থিত অজয়তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব গ্রাম। ঐ গ্রাম প্রাচীন কালে কোন বিখ্যাত তীর্থ, সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ তীর্থ বা বিখ্যাত নগর ছিল এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীবর্গ ও কেন্দুবিল্বের লোক সাধারণতঃ ভদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কালক্রমে ঐ নগর বা তীর্থস্থান যখন অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিত হয়, জয়দেব সেই সময়ে কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জয়দেবের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। বোধ হয় তিনি শৈশবকাল কেন্দুবিল্বে অতিবাহিত করিয়া কোন বিজ্ঞ ও বিদ্বান শিক্ষকের নিকট বা চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই বিদ্যাশিক্ষার স্থান সেকালের হিন্দু শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বা

---

* এই বংশের গোত্র বা উপাধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কোন কোন মতে তিনি আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কোন বংশ সম্ভূত।

বিখ্যাত ইউনিভারসিটী নবদ্বীপ। সেখানে এই শিক্ষাকেন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় তিনি পারদর্শী হইয়াছিলেন। কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণাদিই তাঁহার অধিকতর মনোরঞ্জন করিত। তিনি মেধাবী ছিলেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দশাবতারের স্তোত্র এবং কবিযশোলিপ্সু হইয়া নানাবিধ শ্লোক তিনি নবদ্বীপে অবস্থান কালেই রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি যেমন কবি, প্রথম হইতে তেমনি ভাবুকও ছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গের সমাজ ও ধর্ম্ম অত্যন্ত বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল সুতরাং জীবনের প্রথম হইতেই সেই কুধর্ম্মের দিকে তাঁহার মনোযোগ প্রসারিত হইয়াছিল।

বিদ্যাশিক্ষার পরে সংসারে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজন কেহ বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। এইজন্য সংসারের কোন বন্ধন না থাকায় সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি দেশ ভ্রমণে বা তীর্থ ভ্রমণে অথবা ধর্ম্মজীবনের উন্নতিকল্পে উদাসীন ভাবে বাহির হইয়া যান। খুব অধিককাল সে ভাবে অতিবাহিত করেন নাই। পশ্চিম দেশে কিছু দূর পর্য্যন্ত পর্যটন করিয়া এবং প্রধান প্রধান কতিপয় ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল দেখিয়া ও তাহাদের ধর্ম্মমত অনুধাবন করিয়া তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন এবং তৎপরে নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে বা তাহার পথে তাঁহার উদাসীন ভাবে জীবন কাটাইবার সকল কল্পনা দূর হইয়া যায়।

কোন ব্রাহ্মণ সপরিবারে জগন্নাথ তীর্থে যাইতেছিলেন ; যাইতে যাইতে জয়দেবও তাঁহাদের পথের সঙ্গী হইয়া পড়িয়া একসঙ্গে জগন্নাথ পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন। জয়দেবের সহিত কিছু দিন একত্র থাকায় ঐ ব্রাহ্মণ জয়দেবের কুল, গোত্র, বংশ প্রভৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন এবং জয়দেবকে শিক্ষিত সুপুরুষ ও ঈশ্বরপরায়ণ বুঝিতে পারিয়া এরূপ

উপযুক্ত পাত্র একান্তই দুর্লভ এই বিবেচনায় তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যা পদ্মাবতীর সম্বন্ধ স্থির করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। স্বপ্নে এই বিষয় দেখিয়া জগন্নাথদেবই স্বপ্নে এ আদেশ দিয়াছেন ইহাও ব্রাহ্মণ মনে করিয়া থাকিতে পারেন। পদ্মাবতীর বয়স দ্বাদশ বৎসর ও তিনি অসামান্য রূপবতী, পিতার সঙ্গে সঙ্গেই জগন্নাথ যাইতেছিলেন এবং নিত্যই কাব্যময়-চিত্ত যুবক জয়দেবের নয়নপথবর্ত্তিনী হইতেছিলেন।

প্রস্তাব জয়দেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি কিছুকাল বিবাহ করিব না বলিয়াই সংকল্প করিয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার উদাসীন জীবন ও সংসারাশ্রম করিবার বাসনা, উভয়কে তুলাদণ্ডে চাপাইয়া বিচার করিতে করিতে পদ্মাবতীই তাঁহার "সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলা" হইয়া পড়িলেন, যুবকের অন্তঃকরণে রূপের মোহই প্রবল হইল।

বিবাহ ও সংসারাশ্রম অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। সম্বন্ধ স্থির হইলে তিনি অগ্রেই কেন্দুবিল্বে আসিয়া উপনীত হইয়া থাকিবেন। বোধ হয় তাঁহার ঘর বাড়ী তখন সেখানে ছিল না এবং বহুদিনের পর উদাসীন বেশে দেশের লোক তাঁহাকে চিনিতেও পারে নাই।

পদ্মাবতীর পিতা কেন্দুবিল্বেরই দক্ষিণ প্রদেশস্থ কোন স্থানের লোক হইবেন—সম্ভবতঃ প্রাচীন বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, বগড়ী বা চন্দ্রকোণা। কারণ এক দেশস্থ লোক না হইলে স্বকীয় সমাজভুক্ত হইবার সম্ভাবনা সেকালে কম থাকিত। জয়দেব কেন্দুবিল্বে আসার কিছু দিবস পরে তিনি সেখানে কন্যা লইয়া আসিয়া উপনীত হইলেন। জয়দেবের দেশস্থ কোন রাজা বা বড় জমিদার পূর্ব্ব হইতেই জয়দেবের বিদ্যা, কবিত্ব এবং গুণে মুগ্ধ ছিলেন; জয়দেব দেশে আসিলে তিনিই তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। সংসারধর্ম্ম করিবেন শুনিয়া নিরতিশয় সুখী হইয়া তিনি

জয়দেবের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং সর্ব্ববিধ দেশাচার ও শাস্ত্রাচার বিহিত বিধানে জয়দেবের পরিণয়ক্রিয়া পদ্মাবতীর সহিত তিনিই সম্পন্ন করাইয়া দিলেন।

কেন্দুবিল্বে জয়দেব রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। খুবই সম্ভব এই ঘটনা তাঁহার বিবাহের ও যৌবন সুখভোগের অনেক পরে এবং গীতগোবিন্দ রচনারও পরে। প্রাচীন কালের কোন মূর্ত্তি সেখানে ছিল কি না বলা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও উক্ত রাজাই তাঁহার সর্ব্ববিধ সহায় হইয়াছিলেন।

বিবাহ করিয়া অনেক দিন তিনি পত্নীকে লইয়া সাংসারিক সুখভোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে অতিরিক্ত দৈন্য বা দুঃখকষ্ট ঘটে নাই। তাঁহার দাম্পত্যজীবন অতি সুন্দর ও বিশুদ্ধ, পদ্মাবতীর প্রতি প্রেম ও কর্ত্তব্যানুরাগও অতি মহৎ। তিনি কবি, কবিসুলভ রচনা তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে অনেক লিখিয়াছিলেন, সবগুলিই কালস্রোতে কোথায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু কতকগুলি বর্ণিত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য বিহীন সাধারণ বিষয়ের শ্লোক গীতগোবিন্দ কাব্যাকারে গ্রথিত হইবার সময় তাহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

কিছু দিন সংসার সুখে অতিবাহিত করিয়া কিছু পরিণত বয়সে কালের কুনীতি অধিকতর রূপে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং হৃদয় ব্যথিত করিতে লাগিল। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এবং ঘরে ঘরে তিনি কলিকলুষ বা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিকৃত রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া করিয়া সেই কলিকলুষ নষ্ট করিবার জন্য নিজেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। গীতগোবিন্দ প্রণীত হইতে লাগিল।

গীতগোবিন্দের কতকগুলি গীত প্রথমে রচিত হইয়া রাধামাধবের কাছে গীত হইত। তারপর ইহাকে কাব্য ও পালার আকারে সজ্জিত

করা হইল। শৃঙ্খলাসমন্বিত ঐ পালা পরশরাদি কতিপয় বিদ্বান্ ও সুগায়ক বন্ধুর হস্তে অর্পিত হইল। তাঁহারা দেশে দেশে তাহা গান ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাজের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করিলেন। এই পুস্তকের নূতনত্ব, ইহার লালিত্য ও ইহার কবিত্ব পুস্তক প্রণীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে দেশের মধ্যে ও দূর দুরান্তরে বিখ্যাত করিয়া দিল। ইহা তীর্থ যাত্রীর কণ্ঠে জগন্নাথ ও বৃন্দাবনেও অগ্রসর হইল এবং সেখান হইতে আরও দূরদেশে চলিয়া গেল। দেশের মধ্যে এই পুস্তক বিখ্যাত দেবালয়, এমন কি, কালী বাড়ীতেও, ও বিখ্যাত রাজবাড়ী সমূহে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ গীত হইতে লাগিল।

জয়দেব বঙ্গীয় সমাজের ও তাৎকালিক প্রচলিত ধর্ম্মের সংশোধনের জন্য গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার গীত ও তাঁহার পালার ব্যাখ্যা শুনিয়া সমাজের কদাচার* মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে জয়দেব আর এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মেলা বা মহোৎসব পরোক্ষভাবে ধর্ম্ম প্রচারের সহায়ক। বৌদ্ধ যুগেও অনেক সময় মহামেলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়নিনাদ ঘোষিত হইয়াছিল।

পৌষ মাসের সংক্রান্তি বৎসরের শেষ দিন। ১লা মাঘ হইতে একমতে বৎসর গণনা করা হয়।† অদ্যাবধি বহুলোক বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, বহু কার্য্যে এই নিয়মানুযায়ী বৎসর গণনা করিয়া থাকে। ১লা মাঘকে সে দেশে চলিত কথায় "আখন যাত্রা" বলে। এই আখন যাত্রায় কৃত অনেক কার্য্য সেদেশে শুভফলদায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। সংক্রান্তির মকরস্নান এ দেশের লোকের ধারণায় একটী চিরপ্রসিদ্ধ বহু পুণ্যময় কার্য্য। এই মকর উপলক্ষে দেশের ছোট বড়,

* এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের অন্যত্র প্রকটিত হইয়াছে।

† লক্ষ্মণ সেন প্রচলিত অব্দও ১লা মাঘ হইতে আরম্ভ।

ভদ্র গরীব সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং নিম্নবঙ্গের দুর্গোৎসবের তুলনায় তদপেক্ষাও অধিক সমারোহের আয়োজন করিয়া থাকে। জয়দেব বুঝিলেন যে মকর সংক্রান্তির সংযোগেই তাঁহার মেলা ও স্বীয় মত প্রচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়।

যিনি সাধু, যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তিনি ক্ষুদ্র পল্বল মধ্যেও গঙ্গার পুণ্য সলীল দেখিতে পান, সুতরাং জয়দেব কদম্বখণ্ডির ঘাটে যে গঙ্গাকে পাইবেন তাঁহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ অজয় গঙ্গারই উপনদী এবং সঙ্গমস্থল হইতে যে অত্যধিক দূর তাহাও নহে। হয়ত জয়দেব ধ্যানবলে গঙ্গাকে সেখানে দেখিয়াও থাকিতে পারেন কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী যুগের লোক গঙ্গা সেখানে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন বা হইবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিল না। জয়দেব এই ভাবে পৌষ সংক্রান্তিকেই জনতার উপযুক্ত সময় বোধে প্রচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে, অজয়ই তাহার নিকট গঙ্গা। জয়দেব মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে প্রলোভন দেন নাই কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক লোক যাহাতে গঙ্গা দেখিয়াছিলেন সেই কদম্বখণ্ডিই যে গঙ্গা লোকে সহজেই সেই কথা বিশ্বাস করিল। এবং এই বিশ্বাসে দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হইয়া সেখানে এক মহামেলার সৃষ্টি করিল।

জয়দেব সেই মহামেলায় রামানন্দ-প্রবর্ত্তিত পন্থা বা শ্রীক্ষেত্রের অনুকরণে সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রম এক করিবার চেষ্টা করিলেন। গীত-গোবিন্দ রচনা তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম উদ্যম এবং মহামেলা তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম। এ উদ্যম চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিময় উদ্যমের সমকক্ষ না হইলেও বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই নূতন এবং সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। এই উদ্যমই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চেষ্টার পথ অতি সহজ করিয়া দিয়াছিল। গীত-গোবিন্দের প্রচার ও এই মহামেলার সৃষ্টি উভয়ে সম্মিলিত হইয়া সেকালের

সমাজের দৃষ্টি তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনুমান হয় গীত-গোবিন্দের দেহি-পদ-পল্লবমুদারং কাহিনী জয়দেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছিলেন। জয়দেবের জীবনকালেও যে না হইতে পারে তাহারই বা কি কারণ আছে? গীত-গোবিন্দ প্রথমেই ধর্ম্মপুস্তক সমূহের মধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় মত প্রচারের বা সেকালের সাধারণ লোককে তাঁহার মতের দিকে আকৃষ্ট করিবার উপায় স্বরূপ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু কালে যখন সেই প্রেমের চিত্র ধর্ম্মপুস্তকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িল তখন কোন কোন কূট-নীতিজ্ঞ বৈষ্ণবের মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকিবে যে যিনি সাক্ষাৎ ভগবান তাঁহার মস্তকে পা দিবার অধিকারী এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কে আছে এবং জয়দেবের ন্যায় বিদ্বান্ ও মহাত্মা লোকের লেখনী হইতে কেন এ কথা বাহির হইল? জয়দেবের জীবিতকালেও এ প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। চৈতন্যদেবের জীবনে যদি পদে পদে অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে পারে, এই সুসভ্য বিজ্ঞানবিভাসিত অবিশ্বাসকলুষিত পৃথিবীতে যদি পরমহংসদেব বা মহাত্মা কেশব সেনও অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া গিয়া থাকিতে পারেন তবে জয়দেবের জীবনেও যে এবম্ভূত কোন ঘটনা ঘটিয়া না থাকিতে পারে কে বলিল? কিন্তু এই কাহিনীর কার্য্যকরী ক্ষমতা যে অত্যন্ত অধিক এবং ইহা যে জয়দেবের প্রদর্শিত পন্থা প্রচারের সহায়তা করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। গীত-গোবিন্দ রচনা ও এই মহামেলা স্থাপনার পর জয়দেব আর নীলাচলে গমন করেন নাই কারণ তিনি জগন্নাথধামকে বঙ্গেই আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচিত গীত-গোবিন্দ জগন্নাথে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উৎকলের কোন রাজা, সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমের পরবর্ত্তী কালের

কোন রাজা, বিদেশীয় ব্যক্তির লিখিত পুস্তকের (জগন্নাথের মন্দিরে পর্য্যন্ত) এ প্রকার প্রসিদ্ধি সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া স্বদেশীয় কোন পণ্ডিতের দ্বারা অনুরূপ কোন পুস্তক লেখাইয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের নিকট কৃত্রিম কবিতা স্থান পায় নাই এবং সে দেশের পণ্ডিত, ভদ্র ও ইতর লোক পর্য্যন্ত গীত-গোবিন্দেরই গানে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তিনি বহুদিন দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ সুখ্যাতি ও ভক্তির পাত্র হইয়া কেন্দুবিল্বে বাস করিয়াছিলেন। গোস্বামী আখ্যা তাঁহার জীবনকালেই যদি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে এই সময়েই পাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কোন রাজার সহিত বা সাধু মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গিয়া তিনি দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অচিরে আরোগ্য লাভ করেন। ঐ সকল দস্যুর সহিত সুযোগ মত নিজের এক্তিয়ারে তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু কোন প্রকার প্রতিহিংসা না দেখাইয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে বিদেশ গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে পদ্মাবতী রুগ্নশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মৃতপ্রায় হইয়া কাল কাটাইতে ছিলেন, বোধ হয় তাঁহার অলীক মৃত্যু বার্ত্তাও ঘোষিত হইয়াছিল, তখন জয়দেব আসিলে ক্রমে ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য যে তিনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া কিছুকাল ঘর সংসার করার পরে, অর্থ সমাগমের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে বিদেশে গিয়াছিলেন সেই সময়ে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়েন এবং সেই সময়ের মধ্যে পদ্মাবতী রুগ্নশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জয়দেবের সন্তান সন্ততির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবের সন্তানাদি হওয়া নিষিদ্ধ, সুতরাং হয়ত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার

সন্তানাদি থাকিলেও সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তিনি গৃহী ছিলেন একথা সুসিদ্ধ হয়, তাঁহার সন্তান সন্ততি থাকারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই যখন দুষ্প্রাপ্য তখন তাঁহার বংশও যে কোথাও লুক্কায়িত হইয়া না আছে তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

শেষ বয়সে তিনি সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়া ১২ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেখানে শালগ্রাম শিলা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পরে রাধামাধবের ন্যায় কোন মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব-কেই সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট মহামেলার উৎসবের সময় তিনি কখনও কখনও কেন্দুবিল্বে আসিতেন। জীবনের শেষকালে যেবারে আসিয়াছিলেন সেবারে আর ফিরিতে পারেন নাই কেন্দুলিতেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ও সমাধি হয়। আনুমানিক ৭০বৎসর তিনি জীবিতছিলেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের বিগ্রহ কিছুদিন পরে রাজপুতানার জয়পুরে লইয়া যাওয়া হয়।* অদ্যাবধি সেখানে ঘাটি নামক স্থানে তিনি আছেন।

কথিত আছে রাণাকুম্ভের পত্নী মীরাবাই সনাতন গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক হিসাবে মীরাবাই সনাতন গোস্বামীর অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। মনে হয় তিনি জয়দেবের কোন নিকটবর্ত্তী শিষ্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই প্ররোচনায় কুম্ভ গীত-গোবিন্দের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কুম্ভের আদর্শ পুস্তক বৃন্দাবন হইতেই সে সময় গৃহীত হইয়া থাকিবে এই জন্য ইহার পাঠান্তরগুলিকে অপেক্ষাকৃত মৌলিক বলিয়া বোধ হয়।

* একথা বাঙ্গলা ভক্তমালে আছে। কিন্তু অম্বর সহরের নিকট ঘাটি নামক স্থানে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি প্রথমে স্থানান্তরিত করা হয় বলিয়া শুনা যায়।

কাব্য পরিচয়।

১। কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গীতগোবিন্দ পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় ইহা মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই পুস্তকে গোবিন্দলীলা বিষয়ক ২৪টী গীত আছে—রাধা ও গোবিন্দ বিষয়ক ২২টী ও স্তোত্র ২টী। এই গীতগুলির মধ্যে মধ্যে কতকগুলি করিয়া শ্লোক আছে। দুইটী গীতের মধ্যস্থলের সংযোজনা রক্ষার জন্য ঐ শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের রচিত গীতের মধ্যে কোন প্রকার সংযোজনা নাই, কিন্তু যাহারা পালা অনুসারে গাহে, তাহারা সংক্ষেপে দুই এক কথা গাহিবার সময় শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেয়। অধিকন্তু তাঁহাদের গীতের সংখ্যা অনেক অধিক বলিয়া গীতেই সব কথা বর্ণিত হইয়াছে। এমন অনুমানও অসম্ভব নয় যে গীতগোবিন্দের প্রধান প্রধান কতিপয় গীতই জয়দেব সর্ব্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলেন তারপর পালা অনুসারে গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইবার জন্য সংযোজনার আবশ্যক হয় তখন ঐ শ্লোকগুলি লিখিয়া ইহাকে কাব্যের আকার দিয়া থাকিবেন। গীতগুলিতেই যে ঘটনা ব্যক্ত হইয়াছে শ্লোকে তদপেক্ষা নূতন ঘটনা প্রায় পাওয়া যায় না, বরং পুনরুক্তি দোষ অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং কেবলমাত্র গীতগুলি পড়িলেই পালার প্রায় সমস্ত অংশই বিশদ হইয়া যায়, অন্য কোন কথার আবশ্যকতা হয় না। এই হিসাবে জয়দেবের

পুস্তক একখানি গীতিকাব্য এবং জয়দেবই বঙ্গদেশে এই গীতিকাব্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। জয়দেবের গীতিকাব্যের অনুকরণেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের গীতিকাব্যের সৃষ্টি এবং পরবর্ত্তী সময়ে ইহার ক্রমোন্নতি ও পুষ্টি।

অন্যান্য বৈষ্ণব কবির গীতগুলিতে পদের সংখ্যা কম-বেশী সর্ব্বত্রই দেখা যায় কিন্তু জয়দেবের গীতগুলিতে ৮টী করিয়া পদ আছে, ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক স্থানেই ঐ ৮টী করিয়া পদে জয়দেব নিজের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন, কম-বেশী করিতে হয় নাই।

২। কাব্যের শ্লোকসংখ্যা।

গীতের পদগুলিকেও শ্লোকসংখ্যার মধ্যে গণনা করিয়া বঙ্গদেশীয় পুস্তক সমূহে ১২টী সর্গে মোট ২৮৫টী শ্লোক পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশস্থ পুস্তকে আরও দুই চারিটী শ্লোক অধিক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেগুলি কোথা হইতে আসিয়া কিরূপ ভাবে সে দেশের পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে বা বঙ্গদেশীয় পুস্তকের মধ্য হইতে কিরূপ ভাবে লোপ হইয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। বিভিন্ন প্রদেশস্থ পুস্তকে অতিরিক্ত যে শ্লোকগুলি পাওয়া গিয়াছে অথবা বঙ্গদেশীয় পুস্তকের যে শ্লোকগুলি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নোটের মধ্যে সেগুলি সংযোজনা ও তাহার উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণ সগুলির মৌলিকত্বের বিষয় বিচার করিবেন। বঙ্গীয় পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

সর্গ	মোটশ্লোক সংখ্যা	প্রতি সর্গে কয়টী গীত	গীতের পদ সংখ্যা	গীত কাহার উক্তি	সর্গের নাম
প্রথম (ক)	২৬	২	১মটী – ১১, ২য়টী—৯	স্তোত্র—কবির	...
(খ)	২৩	২	প্রত্যেকটী ৮	সখীর	সামোদদামোদর
দ্বিতীয়	২১	২	ঐ	রাধার	অক্লেশকেশব
তৃতীয়	১৬	১	ঐ	কৃষ্ণের	মুগ্ধমধুসূদনন
চতুর্থ	২৩	২	ঐ	সখীর	স্নিগ্ধমধুসূদন
পঞ্চম	২০	২	১মটী—৫, ২য়টী—৮	ঐ	সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ
ষষ্ঠ	১২	১	৮	ঐ	ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ
সপ্তম	৪২	৪	প্রত্যেকটী ৮	রাধার	নাগরনারায়ণ
অষ্টম	১১	১	৮	ঐ	বিলক্ষলক্ষ্মীপতি
নবম	১১	১	৮	সখীর	মুগ্ধমুকুন্দ
দশম	১৬	১	৮	কৃষ্ণের	মুগ্ধমাধব
একাদশ	৩৪	৩	প্রত্যেকটী ৮	প্রথম ২টি—সখীর শেষটি—কবির	সানন্দগোবিন্দ
দ্বাদশ	৫০	২	ঐ	প্রথমটী—কৃষ্ণের দ্বিতীয়টী—রাধার	সুপ্রীতপীতাম্বর
	২৮৫	২৪	১৯৩		

গীতের পদ বাদ দিলে শ্লোকসংখ্যা মোট ৯২টী পাওয়া যায়। এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে সর্গগুলির শ্লোকসংখ্যার সমতা আদৌ নাই। কোথাও ৪২টী আবার কোথাও ১১টী মাত্র।

৩। শব্দ ভাণ্ডার।

খুব সুললিত ছোট ছোট সংযুক্তাক্ষরের বাহুল্যবর্জ্জিত শব্দেই জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতগুলির মধ্যেই এইরূপ শব্দলালিত্য অধিক। শ্লোকগুলির শব্দসমষ্টি অনেক স্থলে রূঢ় হইলেও অন্যান্য কবির লেখার তুলনায় বিশেষ কষ্টোচ্চারণবহুল নহে। ভারতবর্ষের মধ্যে যত ভাষা আছে তাহার মধ্যে বঙ্গভাষাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা কোমল। বঙ্গ-ভাষায় কষ্টের উচ্চারণ, বিসর্গ ও হ'য়ের প্রাচুর্য্য এবং সংযুক্তাক্ষরের আড়ম্বর অপেক্ষাকৃত কম। জয়দেবের সময়ে যে বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল—তাহাও বোধ হয় তদনুরূপ এবং জয়দেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা বঙ্গভাষারই প্রথম উন্মেষ। জয়দেবের অভিধান অত্যন্ত অধিক আয়ত্ত ছিল বলিয়াই এত সুললিত ও মিষ্ট শব্দ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জয়দেবের শব্দ লালিত্য সংস্কৃত ভাষায় অতুলনীয়, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। যে রচনা মানুষের কানে মিষ্ট লাগে ও হৃদয়গ্রাহী হয় তাহাই লোকে যথেষ্ট অনুকরণ করিয়া থাকে কিন্তু জয়দেবের ন্যায় গীতিকাব্য ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় আর প্রণীত হয় নাই। এ অনুকরণ কাহারই সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।

লালিত্যের জন্য অতি সহজ শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁর মধ্যে কতকগুলি শব্দ তিনি অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন, সেগুলি তাঁর সমধিক প্রিয় ছিল। কলিত, ললিত, উদার, মণ্ডন, দল, দর, তরল, পরিসর, মৌলি, মুগ্ধ, তরুণ, বিলাস, বিহিত, বলিত, বিগলিত, স্মর, পরিরম্ভণ, বলয়িত, মেদুর, মুখরিত, বিলোল, পীন, মিলিত, পটল, অনুগত প্রভৃতি কতিপয় শব্দের অনেক পুনরুক্তি গীতগোবিন্দে দেখা যায়।

৪। ছন্দ।

জয়দেবের প্রণীত গীতে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে চলিত সংস্কৃত পুস্তকে তাহার আদর্শ প্রায় দেখা যায় না; আবার জয়দেবেরই আদর্শে বঙ্গীয় কবিতার ছন্দ গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গীতগুলির ন্যায় এত প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর অথচ কবিত্বপূর্ণ রচনা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আর নাই। কিন্তু মধ্যস্থ শ্লোকগুলি ইহার বিপরীত। তাহার শব্দগুলি কষ্টোচ্চারণবহুল না হইলেও এবং মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও শ্লোকগুলির রচনার মধ্যে লালিত্য অল্প বলিয়াই বিবেচিত হয়। কালিদাসের রচনার মাধুর্য্য মনে আসিলে জয়দেবের এ শ্লোকগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিতে ইচ্ছা করে না। জয়দেবের শব্দ-পাণ্ডিত্য, ছন্দজ্ঞান ও সুললিত রচনার অভ্যাস এত অধিক থাকাতেও তিনি শ্লোকগুলির রচনায় কেন যে এত রূঢ়রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন অনুমান করা যায় না। অনেকের ইহাকে এজন্য বিভিন্ন হস্তের রচনা বলিয়াই বোধ করা সম্ভব। কাব্যের মধ্যে কতিপয় স্থানে পুনরুক্তি প্রভৃতির বাহুল্যে এ প্রকার সন্দেহ মনে উদিত হইবারও কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে শ্লোকগুলির কার্কশ্যের মধ্যে গীতগুলির মিষ্টত্ব আরও অধিক উপলব্ধি হয়।

গীতগোবিন্দ অনুপ্রাসবহুল। এত অনুপ্রাস না থাকিলে ইহা এতদূর শ্রুতিমনোরমও হইত না এবং গীতগোবিন্দের প্রতি লোকের দৃষ্টিও এত আকৃষ্ট হইত না। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অনুপ্রাসের এ প্রকার প্রাচুর্য্য আর কোন পুস্তকেই নাই। কিন্তু গীতগোবিন্দে যে অনুপ্রাস আছে তাহাতে অর্থ বা ভাবের বিঘ্ন হওয়া দূরের কথা বরং ভাব ও অর্থ আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। কেবল অনুপ্রাসের খাতিরে শব্দ সংযোজনা—বলদ্বাধাং

রাধাং, স্থলজলরুহরুচি, শিখণ্ডিশিখণ্ডক, নিকরকরম্বিত ইত্যাদি দুই একটী স্থানে দেখা গেলেও এগুলিকে যথেষ্ট দোষাবহ মনে করা যাইতে পারে না।

৫। কাব্যের বিষয়।

হিন্দুপুস্তকে নায়িকা সাধারণতঃ তিন প্রকার। সেই তিনের প্রত্যেকটী আবার প্রেমের অভিনয়ে আট অবস্থায় বিভক্ত-প্রোষিতভর্তৃকা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, অভিসারিকা ও স্বাধীনপতিকা। এই অষ্টনায়িকাবস্থায় ব্রজগোপীর প্রেমের গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা গীতগোবিন্দের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রধানা গোপিনীতে এই অষ্টবিধ অবস্থা দেখাইয়া গীতগোবিন্দের রাধা নায়িকা সৃষ্ট হইয়াছে। জয়দেবের উদাহরণে অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ রাধার এই অষ্টবিধ অবস্থার চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, সেইগুলিই বৈষ্ণবপদাবলী।

এই অবস্থা কয়টী প্রকটিত করিতে ঘটনার আধিক্য প্রয়োজন হয় নাই। গীতগোবিন্দে বর্ণিত ঘটনা বা বিষয় অতি সামান্য। কৃষ্ণের জন্য রাধার উৎকণ্ঠা ও বিরহ, অন্য নারীতে আসক্তির জন্য ঈর্ষা ও তজ্জনিত মান এবং অবশেষে মিলনে পরিসমাপ্তি, কেবল এইটুকু কথাই গীতগোবিন্দে আছে, অন্য কিছুই নাই। স্থান বৃন্দাবন বিপিন ও যমুনাকূল। সময়, দুইটী দিন ও দুইটী মাত্র রাত্রি। ইহা বহু দিনের বা বহু বৎসরের দীর্ঘ হুতাশ বা প্রেমের পরীক্ষা নহে।

কাব্যের ঘটনাটুকুকে জয়দেবের নিজের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। কোন কোন টীকাকার পুরাণোক্ত ঘটনা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। গ্রন্থসূচনায় প্রথম শ্লোকটীতে (মেঘৈর্মেদুর ইত্যাদি) যে ঘটনা আছে উহা ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের অনুরূপ।

৬। কাব্যের সারাংশ।

প্রথম সর্গ—বসন্তে প্রকৃতি পত্র পুষ্প ও পরিমলে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া দিয়াছে। বিরহী ও বিরহিণীদিগের হৃদয় স্বতঃই বসন্তজনিত চাঞ্চল্যে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে ও তাহারা অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। এই দুরন্ত বসন্তের দিনে একদা কৃষ্ণবিরহাকুলা রাধা কৃষ্ণের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে কোন একজন সখী বসন্তে প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন ও শোভা রাধাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দিয়া তাঁহার হৃদয় কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তায় আরও উন্মত্ত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন দেখ, তুমি কৃষ্ণকে খুঁজিতেছ, কিন্তু তিনি কি আর একমাত্র তোমাতেই অনুরক্ত, তিনি এই বসন্তের দিনে এই সমীরণ ও পরিমল ব্যাপ্ত সময়ে অন্যান্য কত যুবতী লইয়া বিহার ও নৃত্যগীত করিতেছেন। সখী তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেই বিহার দেখাইয়াও দিলেন। গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া নৃত্যগীত করিতেছে এবং তার মধ্যে কেহ তাঁহাকে চুম্বন, কেহ আলিঙ্গন করিতেছে ও বসন ধরিয়া কেহ যমুনাকূলে তাঁহাকে টানিতেছে এবং কৃষ্ণও তদনুরূপ প্রতিদান দিতেছেন।

দ্বিতীয় সর্গ—কৃষ্ণের আচরণে রাধার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল তিনি ঈর্ষ্যায় জর জর হইলেন এবং দীনভাবে কোন একটী লতাকুঞ্জ মধ্যে গিয়া বসিয়া সখীকে মনের বেদনা বলিতে লাগিলেন। ক্রোধ খুব প্রবল হইল না, ঈর্ষায় দগ্ধ হইলেও ভালবাসারই আধিক্যে তিনি প্রথমে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের কথারই আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং পরে কৃষ্ণের গুণাবলী ও তাঁহার সহিত সম্ভোগসুখের কথা মনে আনিয়া বড় চঞ্চল হইলেন, অবশেষে কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য সখীকে ধরিলেন।

তৃতীয় সর্গ—রাধিকা কৃষ্ণের নিকট হইতে ঈর্ষাবশে চলিয়া গেলেন জানিয়া কৃষ্ণও এদিকে রূপবতী ব্রজাঙ্গনাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনাকূলে অত্যন্ত বিরহকাতর চিত্তে কোন কুঞ্জ মধ্যে বসিয়া খেদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ সর্গ—এই অবস্থায় রাধিকার সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন এবং রাধিকার নিদারুণ বিরহযন্ত্রণায় কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সখী বলিলেন চন্দ্রকিরণও তোমার বিরহে রাধিকার নিকট অসহ্য হইয়াছে, বক্ষের হারকেও তিনি ভার বোধ করিতেছেন, চন্দনকে বিষবৎ ও কিশলয় শয্যাকে হুতাশন সম বোধ করিতেছেন, তোমার বিরহে পৃথিবীর অতি সুখময় জিনিসও তাঁহার পক্ষে এইরূপ। তারপর তিনি চিত্তেও উন্মাদ প্রায় হইয়াছেন, তোমার চিত্রাঙ্কন করিতেছেন, হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন এবং কখনও বা মূর্চ্ছিত হইতেছেন। সখীগণ নলিনীদল, অনুলেপনাদি নানা উপচার প্রয়োগ করিতেছেন কিন্তু কোন ফল হইতেছে না, অনবরত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছেন এবং অবশেষে মৃত্যুই নিশ্চয় জানিয়া কেবল হা হরি হা হরি, করিয়া শেষের দিন গণিতেছেন। কেবল এই অবস্থায় একটুখানি চক্ষের দেখা বা একবার আলিঙ্গনের জন্যই তিনি প্রাণ ধরিয়া আছেন। সেখানে তোমাকে যাইতেই হইবে, যদি না যাও তাহা হইলে তোমার ন্যায় বজ্রহৃদয় আর নাই।

পঞ্চম সর্গ—কৃষ্ণ সব শুনিলেন কিন্তু হঠাৎ যাইতে সাহস করিলেন না; বলিলেন আমি এইখানেই থাকিতেছি তুমি যাও, গিয়া আমার হইয়া অনুনয় করিয়া রাধাকে এখানে লইয়া এস। এই ভাবে যাচিত হইয়া সখী ফিরিয়া আসিলেন এবং কৃষ্ণের পক্ষেই বলিতে লাগিলেন, যে কৃষ্ণও তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন, তোমার রাগ করিবার কোন হেতু নাই। তিনিও তোমার বিরহে চন্দ্র-কিরণ অসহ্য বোধ করিতেছেন, ভ্রমর ঝঙ্কার করিলে

কর্ণ আচ্ছাদন করিতেছেন, গৃহ ছাড়িয়া বন আশ্রয় করিয়াছেন এবং ধূলায় পড়িয়া রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিতেছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার তোমাদের যে নিকুঞ্জে মনের মত সুখলাভ ঘটিয়াছিল তিনি সেইখানে অপেক্ষা করিতেছেন, রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে, অতি রম্য অভিসারের সময়, দেরী করিও না, অভিসারে চল। সম্ভোগসুখের অনেক প্রলোভন সংযুক্ত কথাও সখী রাধাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য তাঁহার স্মৃতিপথে আনিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ—শুনিয়া রাধিকা সুখী হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে অভিসারে যাইতে নিতান্ত অক্ষম দেখিয়া পুনরায় সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, বলিব কি, তিনি উৎসাহের সহিত অভিসারের জন্য উঠিতেছেন কিন্তু তিনি এতই বিরহকৃশ যে এক পা চলিয়াই পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহার অবস্থা তোমাতেই একমাত্র তন্ময়, এমন কি, তিনি তিমিরকেও কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তোমার আগমন প্রতীক্ষায় দুর্বহকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন।

সপ্তম সর্গ—রাত্রির প্রথমাংশ অন্ধকার। সখীর এইরূপ যাতায়াতে চন্দ্র উদিত হইয়া বৃন্দাবন আলো করিয়া ফেলিল। তখন বিরহবিধুরা রাধা পুনরায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়, আমার রূপ যৌবন ও বলয়াদি মণিভূষণ সবই বিফল। যাহার জন্য এই গহন বনও তুচ্ছ করিয়াছি, সে একবার মনেও করিল না। হয়ত কোন ভাগ্যবতী নারী কৃষ্ণকে লইয়া বিহার করিতেছে। সময় অতীত হইয়া গেল তবু কৃষ্ণ যখন আসিলেন না তখন সখী নিশ্চয়ই আমাকে প্রবোধজনক কথায় প্রতারিত করিয়াছে ও মিথ্যা করিয়া হরির বিরহ কথা বলিয়া গিয়াছে। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সখীকে একাকিনী ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন, তখন সন্দেহ আরও প্রবল হইল, নিশ্চয়ই হরি আমা

অপেক্ষা কোন অধিক গুণবিশিষ্টা নারীর সহিত সম্ভোগসুখে মত্ত আছেন। হায় হায় তাহার কতই সুখ, সে কত সৌন্দর্য্য ও কত আনন্দ প্রাণে লইয়া আপনাকে উপভোগ করাইতেছে ও কৃষ্ণের আদর পাইয়া প্রাণ ভরিয়া ফেলিতেছে। হায়, নিশ্চয়ই যখন সেই কপট অন্য রমণীতে আসক্ত, তখন এ প্রাণ আর রাখিব না, ঘরেও ফিরিব না।

অষ্টম সর্গ—এইরূপ বিলাপে কোনরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতে কৃষ্ণ আসিয়া বিনীত ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অনুনয় বচনে রাধিকাকে প্রীত করিতে চেষ্টা করিলেন। রাধিকা কৃষ্ণের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এখন ক্রোধ ও অভিমানে কৃষ্ণের সহিত প্রণয় সম্বোধন না করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাত্রি জাগরণে চক্ষু অলস নিমেষপূর্ণ, কজ্জলমলিন চক্ষুর চুম্বনে অধরে কালিমা, বক্ষে চরণের অলক্তক রাগ, অতএব হে কৃষ্ণ আর মিথ্যা কথায় কাজ কি, যার অনুরাগ তোমার বক্ষে ও চক্ষে প্রকাশিত যে তোমার দুঃখ ঘুচাইয়া সুখ দিতে পারে তারই কাছে যাও, এখানে কেন? ছি ছি তোমার এই প্রভাতসজ্জা দেখিয়া আমার লজ্জা পাইতেছে। এই বিদ্রূপবাক্যের সহিত গালিও দিলেন, তুমি নির্দ্দয়, নারীবধ তো তোমার বাল্যজীবন হইতেই আরম্ভ, তোমার বাহিরও যেমন, ভিতরও তেমনি। গালি খাইয়া কৃষ্ণ পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

নবম সর্গ—কলহ করিয়া কৃষ্ণকে তাড়াইয়া রাধিকা আবার আকুল হইয়া কাঁদিতে বসিলেন। এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার দেখিয়া সখীও তখন গালি দিতে লাগিল; এই উন্মত্ত যৌবন, এই বসন্ত পবন, ঘরে বসিয়া ত বড়ই সুখ! কতবার বলিলাম শুনিলে না এখন কেন কাঁদিয়া মরিতেছ? চন্দন তোমার বিষের মত, চন্দ্র-কিরণ অগ্নিবৎ, তুমি যেমন বিপরীতকারিণী এ সব তার উপযুক্তই বটে। গালি দিয়া সখী বলিলেন আমার উপদেশ

শোন, কোন দুঃখ থাকিবে না, হরির নিকট যাও এবং বিনয় বচনে তাঁকে তুষ্ট কর।

দশম সর্গ—সন্ধ্যার পূর্ব্বে সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ আবার আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন রাধিকার রোষ অনেক কমিয়াছে এবং দীর্ঘ নিশ্বাসে মুখমণ্ডল ম্লান। এবং তিনি সখীদিগের প্রতি সলজ্জদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। শুভ লক্ষণ অনুভব করিয়া কৃষ্ণ মানভঞ্জনে তৎপর হইলেন। হে প্রিয়ে, হে চারুশীলে, অকারণ মান পরিত্যাগ কর, একটুও কথা কও ও একবার মুখকমলের মধুপান করিতে দাও। যদি রাগ করিয়া থাক তবে নয়নবান দ্বারা আমাকে বিদ্ধ কর, ভুজরজ্জুতে বাঁধ, দন্তে নিপীড়ন কর, যে শাস্তিতে তোমার সুখ হয় তাহাই কর। আবার অনেক খোসামুদীও করিলেন, বল, তোমার পাদদ্বয় বক্ষে লইয়া আলতা পরাই; তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন ও তুমিই আমার ভবজলধিরত্ন, তোমার ঐ উদার পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর। প্রণয়িণীকে খুসী করিবার জন্য আরও যত প্রকার খোসামুদীর বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা করিলেন এবং বলিলেন তুমি ভিন্ন এ হৃদয়ে আর কাহারই স্থান নাই, সবটা তুমিই দখল করিয়া আছ। এবম্ভূত সুদক্ষ প্রণয়বাক্যে শ্রীমতী অবশ্যই প্রসন্ন হইলেন।

একাদশ সর্গ—সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইল। মিলনমনোহর বেশে কৃষ্ণ কুঞ্জশয্যায় গমন করিলেন এবং রাধিকাও সুশোভন বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন। কিন্তু রমণীসুলভ লজ্জায় তখনও রাধিকার বিলম্ব দেখিয়া একজন সখী তাঁহাকে ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে করিয়া কুঞ্জগৃহের দ্বারে লইয়া গিয়া অনেক বুঝাইয়া ও প্রলোভনে তুষ্ট করিয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তখন কৃষ্ণের চিত্তোন্মাদী অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রাধার চিত্ত বিমোহিত হইয়া উঠিল এবং তিনি অনিমেষনেত্রে

সেই সৌন্দর্য্য পান করিতে করিতে আনন্দে হর্ষাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। সখীগণ তাঁহাকে কুঞ্জমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া ছলক্রমে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাদশ সর্গ—সখীরা চলিয়া গেলে সলজ্জ দৃষ্টিতে রাধা কুঞ্জশয্যার দিকে চাহিতেছিলেন দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেমাহ্বান করিতে লাগিলেন। এস, একবার কিশয়লশয়নতলে উপবেশন করিয়া তোমার নারায়ণকে ভজনা কর। একবার করকমলের দ্বারা তাঁহাকে তোমার চরণ পূজা করিতে দাও ও তোমার অনুগত নূপুরের ন্যায়ই তাঁহাকে একবার গ্রহণ কর। একবার অমৃতমাখা বচনে তাঁর সঙ্গে কথা কও ও তাঁহার বিরহ দগ্ধবক্ষে আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার কামতাপ শোষণ কর। এইরূপ প্রিয়বাক্যে চিত্তবিনোদন করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে শয্যায় আনিলেন।

যুবক যুবতীর সুখাবসানে রাধিকার গোপন সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণ যখন অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন অতি আদরে ও প্রেমে ভরিয়া গিয়া রাধিকা তখন তাঁহাকে তাঁহার বিশৃঙ্খল সৌন্দর্য্য সজ্জিত করিয়া দিবার জন্য আব্দার করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও তাহাই করিয়া দিলেন।

৭। কাব্যে বর্ণিত চরিত্র।

এই ক্ষুদ্র কাব্যে কেবলমাত্র তিনটী চরিত্রের উল্লেখ হইয়াছে, রাধা, কৃষ্ণ এবং একজন সখী (ইঁহার কোন নাম নাই)। একাদশ সর্গে সম্ভবতঃ আরও একজন সখীর অল্পমাত্র উল্লেখ আছে।

গীতগোবিন্দ পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একালের নভেল বা কাব্যের ন্যায় চরিত্র বর্ণনার জন্য জয়দেব পুস্তক লেখেন নাই, সুতরাং চরিত্রের আদর্শ বা প্রণয়ের উদার ভাব যদি এ পুস্তকে কেহ অনুসন্ধান করিতে যান, তবে নিশ্চয়ই তিনি বিফলমনোরথ হইবেন। বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত লোক জয়দেবের লেখাকে অশ্লীল বা অপাঠ্য বলিতেছেন,

চরিত্র বর্ণনার বিশেষত্ব ইহাতে নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহাদের কতক-পরিমাণে এই ধারণা হইয়া থাকিবে।

গীতগোবিন্দে যে ভাবে নায়ক ও নায়িকা চিত্রিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, জয়দেব সেই পুরাণোক্ত কৃষ্ণকেই গীতগোবিন্দে দেখাইয়াছেন। কল্পনা দ্বারা তাহার কোন অংশ কম বা বেশী করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কেবল তাঁহার প্রেম ও সম্ভোগের বর্ণনাকে স্পষ্টতর করিবার জন্য যেটুকু আবশ্যক তাহাই বর্দ্ধিত বা বিস্তৃত করিয়াছেন মাত্র।

পুরাণে যদি কৃষ্ণচরিত্র পরকীয়া নায়িকাদি দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন থাকে, তাহাতে জয়দেবের কোন দোষ হইতে পারে না এবং পুরাণের সমালোচনা গীতগোবিন্দের মধ্যেও আনিয়া ফেলিতে পারা যায় না।

গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ রাধার প্রেমেই বিভোর। তিনি বসন্তে শত নারী পরিবৃত হইলেও রাধাতেই তাঁহার একমাত্র অনুরাগ এবং একমাত্র রাধার সহিত বিলাসের জন্যই চঞ্চল। লালসা, বিরহ, মিলন ও সম্ভোগ-ঘটিত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন কথা গীতগোবিন্দে প্রকটিত করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রের সেই অংশই ইহাতে স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে। টীকাকারদিগের মতে তিনি সর্ব্বনায়ক শিরোমণি, তাঁহারা শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল গীত হইতে তাঁহাতে অখিলনায়কগুণসমন্বয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু গীতগোবিন্দের ঘটনাবলীর মধ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে সে সকল কথা সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ রাধার প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত এবং রাধার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইলেও গীতগোবিন্দের রাধিকার যেমন কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য উন্মত্ততা ও ব্যাকুলতা দেখান হইয়াছে কৃষ্ণের তাঁহার তুলনায় অনেক কম।

রাধার প্রেমেই কৃষ্ণ বিভোর হইলেও কাব্যের প্রথমাংশে তাঁহাকে সুন্দরী যুবতীমণ্ডলী বেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বসন্তজনিত চাঞ্চল্য বা কৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্যে মত্ত হইয়া কেহ চুম্বন, কেহ আলিঙ্গন ও কেহ যমুনাকূলে আকর্ষণ আদি ইচ্ছাস্বরূপ ব্যবহার তাঁহার সহিত করিতেছিল এবং কৃষ্ণও অবশ্য তথাবিধ প্রতিদান তাহাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়া মূর্ত্তি-মান শৃঙ্গারের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন সে কথাও গীতগোবিন্দে আছে, কিন্তু কবি সে ব্যাপারকে বিপিন-বিনোদকলাসমন্বিত অদ্ভুতকেশবকেলি রহস্য বলিয়াছেন ; ইহার অর্থ বোধ হয় জয়দেব এই মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণের এ চরিত্র যে কি তাহা এ যুগের লোক বুঝিতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণের এ ব্যবহার অদ্ভুত রহস্যময়। নায়কনায়িকাঘটিত প্রেমের মধ্যে দুইটী জিনিস প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনের ভালবাসা এবং শারীরিক সুখের আকাঙ্ক্ষা। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত কবি ও উপন্যাস লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেহই একটীকে বর্জ্জিত করিয়া অন্যটীই কেবল-মাত্র চিত্রিত করেন নাই। তবে একটীর ন্যূনতা ও অপরটীর আধিক্য প্রায় সকলের মধ্যেই থাকিতে পারে। বিরহও দূরে বসিয়া হইতে পারে কিন্তু যাহাতে একবার চখের দেখারও আকাঙ্ক্ষা নাই এ প্রকার বিরহ বা প্রেম কেহ চিত্রিত করেন নাই, জয়দেবের নায়ক নায়িকার মধ্যে মনের আকাঙ্ক্ষা ও শরীরের আকাঙ্ক্ষা উভয়ই আছে কিন্তু শেষোক্ত বিষয়টী বিস্তৃত, রঞ্জিত, এবং জয়দেবের প্রয়োজনানুযায়ী কিছু পরিস্ফুটভাবে কাব্যের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। জয়দেবের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের চিত্রাঙ্কন করিয়া লোককে দেখান। সেই আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগকে অধিকতর সুখময় করিবার জন্য বিরহের প্রয়োজন—সে বিরহ এ ক্ষেত্রে মাথুরের ন্যায় দীর্ঘ হা হুতাশ নহে, যে বিরহে মনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া শারীরিক আকাঙ্ক্ষা নষ্টপ্রায় করিয়া দেয়, তাহা নহে কিন্তু

ইহা নিকটে অবস্থিত প্রেমিক বা প্রেমিকার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অল্পকালের বিরহ, শারীরিক চাঞ্চল্যই ইহার কারণ এবং শারীরিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তিতেই ইহার সমাপ্তি।

জয়দেবের পুস্তকে এইভাবে চরিত্র চিত্রিত হইলেও ইহাতে প্রেমিক প্রেমিকার কতকগুলি আদর্শ মানসিক বৃত্তিও অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণ রাধিকার সৌন্দর্য্যে যেমন বিভোর, তেমনি রাধিকাকে একবার বক্ষে চাপিতে বা একটীবার মুখচুম্বন করিতেই সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল। ভালবাসার এমনি আকর্ষণ এবং ভালবাসার পাত্র এতই সৌন্দর্য্যের আধার যে প্রেমিক প্রেমিকার পদযুগল বক্ষে ধারণ করিতে বা কোলে রাখিতেও সুখানুভব করে; এমন কি, মানভঞ্জনের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য মস্তকে ধরিতেও কুণ্ঠিত নহে। জয়দেবের পুস্তকে এ সকল কথা থাকিতেও শারীরিক সুখের লালসাই অনেক স্থলে বিস্তৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া পাঠকের মনে এ গুলি প্রায় চাপা পড়িয়া যায় এবং তৎপ্রতি অল্প-পরিমাণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। (শারীরিক লালসা কৃষ্ণ ও রাধিকা উভয়েই পরিস্ফুট কিন্তু রাধিকার তুলনায় কৃষ্ণে বহু অংশে কম।)

প্রেয়সী বশীকরণের বা নায়িকার মনোরঞ্জনের জন্য মানসিক বা শারীরিক বা বাচনিক যত প্রকার কৌশল হইতে পারে গীতগোবিন্দের কৃষ্ণে তাহার সবগুলিই সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত। দশম ও দ্বিতীয় সর্গে এবং আরও অনেকানেক স্থলে ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। প্রেম ভিন্ন কৃষ্ণের কোন বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা কাব্যাংশের মধ্যে প্রকটিত হয় নাই। বিশ্লেষণ করিলে আরও কতকগুলি প্রেমের কথার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিন্তু সুবিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

রাধিকা। পুরাণের কৃষ্ণচরিত্রকে জয়দেব যথেচ্ছ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িবার সুযোগ না পাইলেও তাঁহার রাধিকাকে কতকটা ইচ্ছামত গড়িবার পক্ষে কোন

বিশেষ বাধা ছিল না সুতরাং রাধিকাকে জয়দেব তাঁহারই অভিপ্রায়ানুরূপ গঠন করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই জয়দেব ইহাকে দীর্ঘ হা হুতাশে পূর্ণ করিয়া প্রেমের মাদকতা দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু যে বিকৃত সমাজ বা কলিকলুষের যুগে জয়দেব পুস্তক লিখিয়াছিলেন সে ক্ষেত্রে রাধিকার সে চিত্রের প্রয়োজন তিনি দেখিতে পান নাই।

গীতগোবিন্দের প্রথম সাতটী সর্গ বিরহ এবং শেষ পাঁচটী মিলন, এই বিরহাংশে তাঁহার রাধিকা একমাত্র শারীরিক সুখের উত্তেজনায় কাতর। তাঁহার বিরহও কেবল শারীরিক সুখেরই লালসা মাত্র। তিনি যেখানে কৃষ্ণকে চাহিতেছেন সেইখানেই সেই বিকট লালসা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয় আলোড়ন করিতেছে বলিয়া।

জয়দেদেবের রাধিকা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির রাধিকা হইতে বহু অংশে বিভিন্ন। জয়দেবে গুরুগঞ্জনা, শাশুড়ী ননদী পরোশীর ভয় বা তাহাদের উল্লেখ মাত্র নাই বলিলেই হয় কিন্তু সকল স্থানেই প্রায় সেই বিকট লজ্জা-জনক সুখলাভের লালসায় নায়িকা একান্ত অধীর, উন্মত্তপ্রায়। এ রাধা বৈষ্ণব কবির সে রাধাই নহে। স্বকীয়া রমণীতে এ বিকট ব্যাধির কল্পনা সহজে করা যায় না বলিয়াই পরকীয়া নারীই জয়দেবের নায়িকা।

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ ও রুক্মিণী পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণ ও পরকীয়া রাধাই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং যে তরুণ বয়সে এ উন্মত্ত চঞ্চলতা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না সে বয়সের প্রেম না প্রকটিত করিয়া তদপেক্ষা পরিণত যৌবনেরই সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের রাধা সম্ভবতঃ পূর্ণ যৌবনের অপূর্ব্ব চিত্র। মেঘৈর্মেদুর শ্লোক হইতে অনুমান হয় সম্ভবতঃ রাধিকা কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সেও বড়।

জয়দেবের রাধিকা প্রথমেই কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তায় আকুল, "একবার চখের দেখার" জন্য নহে। জয়দেবের বসন্তও সেই কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তার বৃদ্ধির জন্য রাধিকার সম্মুখে চিত্রিত। কৃষ্ণের ব্যবহারে ঈর্ষা ও দুঃখে তিনি কোন একান্ত প্রদেশে চলিয়া গিয়া সখীর নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন কিন্তু সে দুঃখের মধ্যেও পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দনের কথা নেত্রপথে উদিত হইল। কৃষ্ণ সহস্র গুণের আধার হইলেও তাঁহার অন্য কোন গুণগ্রাম তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইল না কিন্তু তাঁহার উৎকট গোপন সুখদানের ক্ষমতার কথা মনে উদিত হইয়া সেই লজ্জাজনক আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং শত ঈর্ষা ও শত যন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া সেই সুখ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য চঞ্চল হইয়া সখীকে কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য সাধিতে আরম্ভ করিলেন।

তারপর কতকগুলি বিরহিণীব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এই বিরহিণী ব্যাপারের মধ্যে কবির লেখনী অনেকাংশে সংযত, কিন্তু সখীর মুখ তথাবিধ সংযত হইবার প্রয়োজন না থাকায় সখীর প্রলোভনও রাধিকার আকাঙ্ক্ষারই অনুরূপ। তিনি (পঞ্চম সর্গ) রিপুর ন্যায় আচরণকারী মঞ্জীর, পীন-পয়োধর পরিসর-মর্দ্দন-চঞ্চল-করযুগ, অপিধান জঘন প্রভৃতি নানা প্রলোভনের উল্লেখ করিয়া রাধিকার আকাঙ্ক্ষা বিরহের মধ্যেও উদ্দীপিত করিয়া তাঁহাকে অভিসারে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। যে যে রসে বিভোর সেই চিত্রই তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ—একালের নভেলের সখী হইলে হয়ত বলিত, চল একবার চখের দেখা দেখিয়া আসিবে বা বুকে মাথা রাখিয়া একটু আদর প্রাপ্ত হইয়া আসিবে।

বিরহিণী ব্যাপারের বাঁধাবাঁধির মধ্যে রাধিকার মুখ হইতে উৎকট আকাঙ্ক্ষার কথা বাহির না হইলেও সপ্তম সর্গে পাগলের ন্যায় তিনি

তাহারই জন্য অধীর হইয়াছেন। তিনি যে সুখের আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করিতেছেন কোন ভাগ্যবতী সুন্দরী হয়ত সেই সুখ ভোগ করিতেছে বলিয়া তিনি ঈর্ষা ও লালসা উভয়েই যুগপৎ অস্থির হইতে লাগিলেন। ক্রন্দন ও দুঃখের মধ্যেও লালসা (বর্ত্তমান যুগের কুরুচি) পরিস্ফুট। নিতান্ত অসঙ্গত ও সামঞ্জস্যবিহীন হইলেও কবি এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়াই রাধিকাতে ঐ ভাবের আরোপ করিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য দৃঢ় করিতে ইচ্ছুক।

সপ্তম সর্গের পরে আর সে বিকট লালসার চিত্র নাই—যতক্ষণ অদর্শন ততক্ষণই দুর্ব্বৃত্ত আকাঙ্ক্ষা। এই পর্য্যন্ত বর্ণনাতেই কবির উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল, ইহার পরে আর তাঁহার লেখনীকে এবম্ভূত কুরুচির চিত্র অঙ্কিত করিতে হয় নাই, এমন কি, সপ্তমেই সে পরিবর্ত্তন আরম্ভ। যা রমিতা বনমালিনা গীতে এই সভ্য যুগের প্রেমের ন্যায়ই প্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। রাধিকার বিরহমধ্যে সে চিত্র অতি সুন্দর ও সুরুচিমার্জ্জিত।

অষ্টমে খণ্ডিতা নায়িকা,নবমে কলহান্তরিতা, দশমে মানভঞ্জন—এগুলির ন্যায় সুন্দর ও মার্জ্জিত রচনা সকল সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এ রচনা প্রাচীন যুগের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেরও আদর্শ।

খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনা আর কিছুই নহে, কৃষ্ণ রাধিকারই সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণকে অন্য কোন নায়িকার নাম পর্য্যন্ত তিনি করিতে দিতে ইচ্ছুক নহেন, সুতরাং কৃষ্ণের এক রাত্রি আগমনের বিলম্ব হেতু তিনি অন্য নারীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছিলেন এই অনুমান করিয়া তাঁহার অঙ্গে রতিচিহ্ন সমূহও কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী নভেলের নায়কও এবম্ভূত গালাগালি খাইয়া থাকেন।

একাদশে অভিসারিকার চিত্রেও তিনি আর উন্মত্ত বা চঞ্চল নহেন,

লজ্জাই এখন তাঁহার একমাত্র ভূষণ। যে কৃষ্ণের জন্য তিনি উন্মত্ততা দেখাইয়াছিলেন, হৃদয়ে ব্যাকুলতা থাকিলেও সখীদিগকে এখন ঠেলিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন জয়দেবের নায়ক নায়িকায় psychological তত্ত্ব নিহিত নাই কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐ অষ্টনায়িকার অবস্থাই একটী psychological শৃঙ্খলায় গ্রথিত। তদুপরি রাধিকার যে এই লজ্জা তাহা বস্তুতঃই রমণীসুলভ। কে বলে রাধিকার চিত্র দুর্ব্বৃত্ত আকাঙ্ক্ষা ও লালসারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত? এই একাদশ সর্গে তিনি কৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যেই একান্ত বিভোর। যে রূপ ভক্তের মনে অঙ্কিত, যে রূপ জয়দেবের উপমাদি, বাগবিলাস দ্বারা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত, রাধিকা সে রূপের দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে চাহেন না, সেইরূপই অনিমেষ নয়নে পান করিতে লাগিলেন। এবং অবশেষে হর্ষাশ্রু তাঁহার নেত্র হইতে বিগলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশে সম্ভোগের চিত্র দেখাইতে হইবে, ইচ্ছা করিলে কবি সেখানে লেখনীকে যথেচ্ছ ছাড়িয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেখানে তিনি গীতগুলির মধ্যে একটুও অশ্লীল ভাব প্রকটিত করেন নাই, কেবল দুই তিনটী খট্‌মটে কষ্টবোধ্য শ্লোকেই সে বর্ণনা সমাপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু সেই কয়টী শ্লোকে যে সৌন্দর্য্য অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে বর্ণনার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বাদশে সম্ভোগের চিত্রের চরম প্রকাশ অপেক্ষা রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম অনুরাগ ও ভালবাসা এবং নায়কের নিকট নায়িকার অতি মনোরম আব্‌দার ইহাই সর্গের দুইটী সঙ্গীতে অধিকতর ও স্পষ্টতর রূপে প্রকাশিত। সপ্তমের শেষ হইতেই রাধার চিত্র বর্ত্তমান যুগের অনুরূপ।

৮০। কাব্যের দোষ ও গুণ।

কি প্রাচীন যুগ, কি বর্ত্তমান যুগ সর্ব্বত্রই যে গীতগোবিন্দ জনসমাজে এত অধিক পরিচিত ইহাই তাহার গুণের প্রধান পরিচায়ক। জয়দেবের সময় হইতেই গীতগোবিন্দের দিকে মনুষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট—যাঁহারা ধর্ম্মালোচনা করেন তাঁহাদের এবং যাঁহারা কাব্যালোচনা করেন তাঁহাদের। গালি দিবার জন্য সমালোচকের দৃষ্টিও বর্ত্তমান আমলে গীতগোবিন্দের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।*

দোষ ও গুণের অল্পতা বা আধিক্য সকল কাব্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, গীতগোবিন্দেও তাহা আছে। সংস্কৃত সাহিত্যিক ইহার ছন্দ, অনুপ্রাস অলঙ্কার ও রীতির গুণ ও দোষের আলোচনা করিয়া সাধারণতঃ সকল বিষয়েই ইহাকে গুণবহুল বলিয়া দেখিতে পাইবেন। ধর্ম্মালোচনাকারী গীতগোবিন্দের ধর্ম্মের ব্যাখ্যাদি সমন্বিত বিবিধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াও পদপল্লব মস্তকে ধারণ করার দোষ স্খ'লনের জন্য গল্পের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ সমর্থনে যে সকল ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি নিযুক্ত তাঁহারাও গীতগোবিন্দের কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিলে ইহার ছন্দ, অনুপ্রাস, অলঙ্কারাদির দোষগুণ বিচার বা ইহার কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা ইহার মৌলিকতা বা ইহার প্রসিদ্ধির সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত বলিয়া কোন লোককে ভাল বলাও যেরূপ, ছন্দ, অলঙ্কার, অনুপ্রাসাদিরূপ পরীক্ষাযন্ত্র সমূহের সাহায্যে কোন কাব্য ভাল বা মন্দ বলাও সেইরূপ।

* গালির জন্য গীতগোবিন্দের পাঠক না কমিয়া বরং বাড়িতেছে বলিয়াই অনুমান হয়।

অলঙ্কার অনুপ্রাসাদি থাকিলেই কাব্য ভাল হয় না কিন্তু ভাল কাব্য বা ভাল লেখার মধ্যে ঐ সকল গুণের সমাবেশ থাকিতে পারে। মেঘ, আকাশ, রৌদ্র, বর্ণ, পর্ব্বত, বৃক্ষাদির ছায়া, পৃথিবীস্পর্শী-চক্রবালসীমা-সর্ব্বসমন্বয়েই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—তাহার বিশ্লেষণে ঐ সৌন্দর্য্যের একাংশ বা বিন্দুমাত্রও অনুভব হইতে পারে না, ভাল কাব্যের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সর্ব্ব সমন্বয়েই তাহার সৌন্দর্য্য বা বিশেষত্ব। যে কাব্যের আবৃত্তি মাত্রেই কর্ণ ও চিত্ত মোহিত হইয়া যায় তাহা ইহার ছন্দ অনুপ্রাসাদি নহে কিন্তু ইহার রচনার নূতনত্ব ও ইহার ধর্ম্মের নূতনত্ব—ইহার কবিত্বের নূতনত্ব ও ইহার বিষয়ের নূতনত্ব। নানাবিধ কাব্যগুণসমন্বিত বহু গ্রন্থ ছিল এবং প্রণীত হইয়াছে কিন্তু প্রাচীন যুগেও এ কাব্যের যেমন নূতনত্ব ছিল বর্ত্তমান-যুগেও ইহার তেমনি নূতনত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। এ কাব্যের তুলনা এই কাব্যেই—অন্যত্র ইহার তুলনা নাই এবং সমকক্ষ কাব্যও প্রণীত হয় নাই। জয়দেবের সহিত ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতির তুলনা কেবল জয়দেবের অপমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইজন্যই মনে হয় লক্ষ্মণ সেনের সমকালীন জয়দেব এ জয়দেবই নহেন তিনি ধোয়ী প্রভৃতির লেখার সদৃশ লেখক অন্য কোন জয়দেব। যে নূতনত্ব পুরাতন হইতে জানে না যাহার অনুকরণ এ পর্য্যন্ত কোন লেখকেরই সাধ্যায়ত্ত হয় নাই তাহার প্রসিদ্ধি কেবল দুই একটী কাব্যগুণের জন্য নহে। জয়দেব সর্ব্বপ্রথমে যখন গীতগোবিন্দ প্রচার করিয়াছিলেন তখনও ইহার রচনায় মানুষ যে নূতনত্ব অনুভব করিয়াছিল আজিও সেই নূতনত্বই আছে, তখনও ইহার ধর্ম্মের যে নূতনত্ব মনুষ্য পাইয়াছিল আজিও এই যুগযুগান্তর পরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কর্ত্তৃক চর্ব্বিতচর্ব্বণ হইয়া গিয়াও ইহার সেই নূতনত্বই আছে। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কত মহাজন বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন তাহার ইতিহাস এখনও লুপ্ত হয় নাই; বর্ত্তমানকালে সমাজ ও

শিক্ষার পরিবর্ত্তনে সে ধর্ম্মের চর্চ্চা মহাজন ব্যক্তিগণ না করিলেও ইহার মধ্যের ধর্ম্ম কি তাহার অনুসন্ধানে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সময় ও সামর্থ্য ব্যয়িত করিতেছেন।

মধুর ভাবে ঈশ্বরোপাসনাই যদি ইহার ধর্ম্মের ভিত্তি হয় এবং ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগের যদি তাহা একটী আদর্শ কারণ হয় তাহা হইলে চৈতন্যসমকক্ষ যে সকল আদর্শ সাধু ও সচ্চরিত্র মহাজন সেই ধর্ম্মের ছায়ায় বসিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন এই কাব্যে বর্ণিত অশ্লীলতাই কি তাহার মূল কারণ? পরমহংসদেবের কথার মধ্যে আছে যে যেমন ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক উপপতির কথাই দিনরাত ভাবে ও তার মধ্যে সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া যায় মানুষের ঈশ্বরোপাসনাও তেমনি হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে সেই পরকীয়ারই যেমন প্রেমের গাঢ়তা ও ঐকান্তিক অনুরাগ —যে অনুরাগ ও মনঃসংযোগের তুলনায় পৃথিবীর যা কিছু আছে সবই তুচ্ছ, ভক্তের অনুরাগের আদর্শ যদি তাহাতেই পাওয়া যায় তাহাতে দোষাবহ কি বুঝিতে পারিতেছি না। মধুর ভাবে উপাসনা যে কি, বর্ত্তমান যুগের বিকৃতমস্তিষ্ক আমরা তাহা বুঝিতে পারি না এবং পারিবও না, কারণ যে চিনি বা তদ্রূপ স্বাদবিশিষ্ট কোন জিনিস খায় নাই চিনির স্বাদ কিরূপ, দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেও সে বুঝিতে পারে না, তবে সে ধর্ম্ম কি তাহা স্বয়ং আস্বাদন না করিয়া বা স্বয়ং না বুঝিয়া যদি ইহাকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ।

গীতগোবিন্দের কোন কোন স্থলে অল্প ভাব লিখিতে ভাষার আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু তাহা পুস্তককে অনুপ্রাসবহুল করিবার জন্য, কবিত্ব তাহার মধ্যেও নাই ইহা বলা চলে না। আজকাল বঙ্গদেশে এক সম্প্রদায় লেখক বলিতেছেন যে যদি শব্দের মিষ্টত্ব খোঁজ তবে জয়দেব পাঠ করিতে পার, কবিত্ব ইহাতে কিছু নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দকে যদি আমরা

সেই বাক্যানুসারে কবিত্ব শ্রেণীভুক্ত না করিতে চাহি, তাহা হইলে টেনিসন, শেলি, মুর, বাইরন, পোপ, ড্রাইডেন, চসার, স্পেনসার প্রভৃতি যত কবির আদর্শকেকবিত্ব বলা যায় তাহার চৌদ্দ আনাই বাদ যায়। বাঙ্গলাদেশে এ কেবল নূতন ধুয়া—আর কখনও ছিল না, জয়দেবের কবিত্বের উপর সন্দেহ বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও হয় নাই। বসন্ত বর্ণনার ন্যায় প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন, যা রমিতা বনমালিনা গীতের ন্যায় বিরহিণীর দীর্ঘনিশ্বাস মানভঞ্জনের ন্যায় হাস্যরসিকতা—এসকলগুলি যদি কবিত্ব শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হয় তাহা হইলে কবিত্বের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত সমালোচকগণ বুঝাইয়া দিবেন। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এ দেশের পণ্ডিতগণ এবং ভিন্নদেশীয় কাব্যসমালোচকগণ কোন দিন এ সন্দেহে উপনীত হয়েন নাই। সুতরাং পৃথিবীশুদ্ধ লোকে যদি বলে চিনি মিষ্ট ও দুই একজন বলে ঝাল তবে সে কথার মূল্য কিছুই নাই।

৯। বর্ত্তমান রুচি ও অশ্লীলতা।

দেশবিখ্যাত না হইলে দেশের লোক কাহাকেও গালাগালি দেয় না। যে দেশের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত বা শীর্ষস্থানীয় তাহারই রুচির বিকার বা কার্য্যকলাপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেই জন্যই সে গালি খায় বা তাহার কার্য্যের সমালোচনা হয়। গীতগোবিন্দের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়াছে।

ইংরাজী, লাটীন, জর্ম্মাণ প্রভৃতি নানা ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইয়াছে, অনেক বড় বড় ইংরাজ পণ্ডিত গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া সুখানুভব করিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি গীতগোবিন্দের কবিত্ব ও ইহার রসে মুগ্ধ, কিন্তু একমাত্র বাঙ্গালীই যেমন বাঙ্গালার কবিকে প্রাণ ভরিয়া গালি দেয় এমন আর কোন দেশে কেহ

দেয় নাই। মায়ের গালি যেমন আশীর্ব্বাদ, জয়দেব তেমনি এইরূপ গালি খাইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই উঠিয়াছেন। হায়, মায়ের গালির মত এমনি গালিই যেন সব লেখকের ভাগ্য প্রসন্ন করে।

এই গালাগালির কারণ এই যে জয়দেবের পুস্তক অশ্লীল। বাঙ্গালীর এক সম্প্রদায় বলে এ পুস্তকের ন্যায় কদর্য্য পুস্তক পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আর নাই, আর এক সম্প্রদায় বলে তোমরা ইহার বুঝিবে কি? এ, সবই ধর্ম্মকথা; ঐ যে অশ্লীলতা, তাহা ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক রহস্যময়। ইহার কোন্‌টাকে ঠিক বলি? নিরপেক্ষ পাঠক সর্ব্বতোভাবে কাব্যখানিকে বুঝিয়া এবং বঙ্গীয় সমাজের কোন্ অবস্থায় ইহা প্রণীত হইয়াছে অনুধাবন করিয়া যদি এ কথার বিচার করিয়া লন তাহা হইলেই এ কথা সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে, তর্কের প্রয়োজন হইবে না।

এক শ্রেণীর লোক আবার পুস্তকের আগাগোড়া না পড়িয়াই বিবেচনা করেন যে গীতগোবিন্দের সর্ব্বত্রই অশ্লীল এবং এই গ্রন্থ পড়িবার অযোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, গ্রন্থের তিন চারিটী স্থান বাদ দিলে ইহাকে অতি সুন্দর ও রুচিবিশিষ্ট সুপাঠ্য কাব্য বলিয়া বোধ হইবে।

কুরুচি ও অশ্লীলতা ত বহু কাব্যেই আছে, তবে জয়দেবের উপর এত আক্রোশ কেন? সম্ভোগ বা বিহার ঘটিত প্রেমের বর্ণনাই কি তাহার কারণ? বোধ হয় তাহা নহে, কারণ বড় বড় সংস্কৃত কাব্যেও তাহা আছে এবং আলঙ্কারিকগণও তাহার বিশেষ ভুল ধরেন নাই। ইহার অন্য একটা কারণ আছে—জয়দেব বিপরীত রতি বা বিহারের বর্ণনা সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর চক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। এই লোকরুচির উত্তেজক বা লোকানন্দদায়ক জিনিস তাঁর পূর্ব্বে, বোধ হয় কোন বাঙ্গালী, পুস্তকের মধ্যে প্রচার করে নাই। বাৎস্যায়ন, ভরত আদির পুস্তকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তাহা থাকিতে পারে, তা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে দুই চারিটা লোক

পড়িত ; অথবা হয়ত তাহা কামকলাভিজ্ঞ ছোকরাদিগের মধ্যেই পরিচিত ছিল ; কিন্তু সভায় সভায় প্রচারের জন্য জয়দেবই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ইহাকে আসরে নামাইয়াছেন, আর জয়দেবের নিকটই গ্রহণ করিয়া তাহা অন্যান্য বৈষ্ণব কবি ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। জয়দেবের এই বিষয়টার বর্ণনাটাই ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া পুস্তকেরমধ্যে ইহা সন্নিবেশিত করেন নাই, কিন্তু সেকালের লোকের রুচিতে এবম্ভূত রচনা কতকটা অনুমোদন করিত বলিয়া কোন উদ্দেশ্যবিশেষ সমর্থনের জন্য ইহা তাঁহার পুস্তকের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। এ বিষয়, গীতগোবিন্দ কেন ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে সেই সমালোচনারমধ্যে দ্রষ্টব্য। যাঁহারা মনে করেন জয়দেব অশ্লীল তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই বিচার করিয়া লইবেন যে জয়দেব উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর লোকের জন্য এ পুস্তক লিখিতে বসেন নাই।

কিন্তু জয়দেব পুস্তকের সকল স্থানই এই অশ্লীলতা দোষে পূর্ণ করেন নাই। প্রধানতঃ পুস্তকের তিন স্থানে এই অশ্লীলতা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়—২য় সর্গে (ষষ্ঠ গীতে) ১২ লাইন, ৭ম সর্গে (চতুর্দ্দশ গীতে) ১২ লাইন এবং দ্বাদশ সর্গে তিনটী শ্লোকে ১২ লাইন, কেবল এই তিনটী সর্গে প্রকাশ্যতঃ অশ্লীলতার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয়ে একবার, চারিসর্গ বাদ দিয়া সপ্তমে একবার, এবং আর চারি সর্গ বাদ দিয়া দ্বাদশে একবার-সময়ের ও সর্গের সমতা রাখিয়া পালার তিন স্থানে সেকালের শ্রোতৃবর্গকে এই অশ্লীলতা শুনান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পাঠক ইচ্ছা করিলে পুস্তকের সেইস্থান ছাড়িয়া দিতে পারেন বা সেখানে চোখবন্ধ করিতে পারেন কিন্তু কবিত্বে বিভোর হইয়া সে লোভ সম্বরণ করা সহজ হয় না।

এই তিনটী স্থান ব্যতীত পঞ্চম সর্গের মধ্যে সখীর মুখদিয়া অভিসারে যাইবার অনুরোধছলে চারি পাঁচ লাইন অশ্লীল ভাবযুক্ত বর্ণনা পাওয়া

যায়। এতদ্ভিন্ন অশ্লীলতার অনুরোধে জয়দেব আর কুত্রাপিও লেখনী পরিচালনা করেন নাই। অন্যান্য সর্গগুলির মধ্যে আর কিছুই নাই, কোথাও কেমন ঈষৎ ভাব বা এক আধটা কথা বর্ণনাচ্ছলে থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কোন্ উৎকৃষ্ট কবির মধ্যে এবং বর্ত্তমান কালে কোন্ আদর্শ নভেলিষ্টের মধ্যেই বা সেরূপ ভাব নাই? জয়দেবের অধিকাংশ সর্গই এত পরিমার্জ্জিত যে একটীও রুচিবিরুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ সেখানে নাই। ২য় ও ৭ম এই দুইটী সর্গে যে অশ্লীলতার বর্ণনা আছে, বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সেই দুইটী স্থলের কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা বিশেষ কিছু নাই এবং তাহার বর্ণনার কোন প্রয়োজন ছিল না, জয়দেব সহজে তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না দিয়া পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করার কারণ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই ঐ গুলি লিখিয়া গিয়াছেন। সপ্তম সর্গের শেষাংশ হইতে দ্বাদশ সর্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অতি পরিমার্জ্জিত ভাব, কেবল দ্বাদশ সর্গের মধ্যে ৩।৪টী শ্লোক অশ্লীলতারসদুষ্ট।

আজি কালিকার সভ্য জগতের পুস্তক একটী চুম্বনের অধিক অগ্রসর হয় না, অনেক রুচিশীল লেখক ততদূরও যাইতে চাহেন না কিন্তু জয়দেবের কবিতা সে সীমা অতিক্রম করিয়া বহু দূর চলিয়া গিয়াছে—এ কালের পাঠককে চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয় কিন্তু জয়দেবের পার্শ্বস্থ সমাজে তাহা হইত না।

লাটীন, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার বহু বিখ্যাত লেখকের লেখা, এমন কি মিলটন্, যাঁহার লেখা সুরুচির আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে তাঁহার লেখাও, স্থান বিশেষে অতি ঘৃণিত অশ্লীলতাদোষে দূষিত। তবে এ দেশের সহিত বিদেশের তুলনার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

তত্রাপি এসম্বন্ধে উইলসন সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্যটী * আমি এ পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে ইচ্ছা করি। ইংরাজ পণ্ডিতগণও আমরা পদে পদে যে রুচিকে নিন্দা করিয়া থাকি তাহার কিরূপ ভাবে সমর্থন করিয়াছেন ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। অশ্লীলতাদোষ আছে বলিয়া সমাজ হইতে কোন পুস্তক দূরীভূত হইতে পারে না, কিন্তু, বৈষ্ণবেরা যেমন বলে যে অধিকারী না হইলে এ পুস্তক পড়িও না, তদ্রূপ নিয়ম অবলম্বিত হইতে পারে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগতে বা মনুষ্যের সৃষ্ট সমাজে এমন কত অশ্লীল দৃশ্যই যে নয়নপথে পতিত ও শ্রুতিগোচর হয় যাহা গণনা করা যায় না, কিন্তু কোন মনুষ্যই আইন করিয়া তাহা ঘুচাইতে সক্ষম হয় না; এ সকল ক্ষেত্রে নিজের সাবধানতাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

---

* I cannot admit however that *Hindu* literature, speaking generally, is more liable to the reproach of indecency than that of *Europe*: nothing can be found in their serious works half so licentious as' are many passages in the writings of Ovid, Catullus, Propertius, and even the elegant Flaccus; to descend to modern times Ariosto and Boccacio amongst the *Italians*; Brantome, Crebillon, Voltaire, La Fontaine, and the writers of many recent philosophical novels amongst the *French*, furnish us with more than parallels for the most indelicate of the *Hindu* writers; with respect to ourselves, not to go back to the days in which "obscenity was wit," we have little reason to reproach with want of delicacy, when we find the exceptionable though elegant poetry of Little generally circulated, and avowedly admired. We should also recollect the circumstances of the *Indian* Society before we condemn their authors for the ungarbled expressions, which we conceive to trespass upon the boundaries of decorum.

১০। আধুনিক সমালোচনা ও জীবনচরিতে কলঙ্কারোপের চেষ্টা।

জয়দেব যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও সম্ভোগের বর্ণনা লিখিয়াছিলেন, জানিতেন না যে তাঁহারই অস্ত্রে একদিন তিনিই আঘাত প্রাপ্ত হইবেন; মনুষ্যের সুখের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করিয়েছেন তাহারই কুফল একদিন বঙ্গদেশ ভরিয়া ফেলিবে এবং তিনিই তাহার জন্য দায়ী হইবেন এবং হয়ত বহু লোক তাঁহারই জীবনে কলঙ্কমসী ঢালিয়া দিবে।

কোন একটা ধর্ম্মমত চরমাবস্থায় বহু শাখায় বিস্তার প্রাপ্ত হয় এবং সামাজিক ইতিহাসে ইহাই দেখা যায় যে সর্ব্বত্রই তাহা কুপ্রথার সৃষ্টি করিয়া থাকে। জয়দেবের উদ্ভাবিত পন্থাও কালক্রমে নানা কুপ্রথার হেতু হইয়াছিল। বৌদ্ধমতেও এই কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, শৈবমতেও হইয়াছিল এবং শাক্ত মতেও হইয়াছিল। কুপ্রথায় চরম বিস্তারেই অবতার বা সংস্কারকের আবির্ভাব। শাক্তমতের কুপ্রথায় যখন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল তখনই জয়দেবের আবির্ভাব। আবার বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই কুপ্রথায় একদিন

These authors write to men only; they never think of a woman as a reader; now even in polished *European* Society, amongst men alone, conversation takes commonly greater liberties than any *Hindu* composition, and it is fair to infer that were our writings addressed only to the male proportion of society, they would partake of a similar character; extreme attention to delicacy would in that case be regarded as puerile or fastidious: it is so now in works of science, and Gibbon and Hume, seem to consider it so in historical writing: if then we were not apprehensive of sullying those minds whose

দেশ ভরিয়া গিয়াছে কিন্তু সে কুপ্রথার বিনাশ সাধনের. জন্য অবতার কই ? এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও উন্নত চিন্তার প্রসারই সেই অবতার। সুশিক্ষা ও উন্নত চিন্তা বক্ষে লইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন তাঁহারাই.কি যুগধর্ম্মের সেই সকল কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই ?

সেই সকল কুপ্রথার উল্লেখেই কোন কোন বাঙ্গালী সমালোচক জয়দেবকে গালি দিয়া জয়দেবের নিজের জীবনের উপরই কলঙ্ক চাপাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রদায়বিদ্বেষী সমালোচকগণই সম্ভবতঃ এই কলঙ্কের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তথাবিধ আলোচনা এখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। সেই ভীষণ কলঙ্ক এই যে পদ্মাবতী জয়দেবের স্ত্রী নহেন, উপপত্নী। আর সেই উপপত্নীর সহিত যে সকল সম্ভোগ সুখ তিনি ভোগ করিয়াছিলেন তাহাই কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শুনা যায় বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবির কবিত্বের স্ফূর্ত্তি পরকীয়া

purity we are interested in preserving, the breach of the rules of delicacy would take place to a greater extent than it has done in works of imagination. I am not sure that were this to happen the quantity of virtue in the world would be much diminished; what is natural, cannot be vicious; what every one knows, surely every one may express; and that mind which is only safe in ignorance, or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble defence and impotent security. I have said more upon this subject than was perhaps necessary, but I am anxious that the *Hindus* should have justice done to them, and not be held up to the world, as they have been by a mistaken, and I am afraid, a spiteful zeal, as monsters of impurity."

প্রেমে, তাঁহারা অনুমান করেন জয়দেবেরও কুৎসিৎ কবিত্বের স্ফূর্তি সেইরূপে। আমাদের বিশ্বাস চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি কেন, জগতের বহু কবিত্বই এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেও পারে, কিন্তু জয়দেবের কবিত্ব সে ছাঁচেরই নহে।

যে যুবক জীবনের মধ্যে প্রেমের লালসা চরিতার্থ করিবার অবকাশ পায় নাই, তাহারই লেখনী প্রেমের কবিতা লিখিবার জন্য অত্যধিকরূপে উৎসুক হয়। আকাঙ্ক্ষা যত অপরিতৃপ্ত, মনের ভাষা ততই পরিস্ফুট। আকাঙ্ক্ষা যেখানে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে, লেখনী সেখানে সে ভাবের পুনরালোচনার জন্য সহজে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে না। বিদ্যাপতি বা চণ্ডিদাস অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উদাহরণ হইতে পারে, কিন্তু গীতগোবিন্দ অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উদাহরণ নহে। আমি এক স্থানে বলিয়াছি রাধার বা কৃষ্ণের বিরহ বৈষ্ণব কবির সে বিরহই নহে, ইহা একদিন বা দুই দিনের বিরহে পুনর্মিলনের বা সম্ভোগসুখের জন্য তীব্র চাঞ্চল্য। জয়দেব যেখানে বিরহী বিরহিণী ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন বা দুর্ব্বৃত্ত আকাঙ্ক্ষার কথা লিখিয়াছেন, তাহা যেন পূর্ব্ব প্রদর্শিত আলঙ্কারিক প্রভৃতির ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন, কেবল কারিকুরীটুকু তাঁহার। গীতগোবিন্দ অতৃপ্ত প্রণয়ের উচ্ছ্বাস নহে, ইহা পরিণত বয়সের রচনা। লেখার পারিপাট্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, বর্ণনার কারিকুরী, পরিণত বয়সে যখন অতি মার্জ্জিত হইয়াছে ইহা সেই সময়ের লেখা। গীতগোবিন্দ বর্ণনা মাত্র, উচ্ছ্বাস নহে।

ধৈর্য্যশীল ও নিরপেক্ষ পাঠক জয়দেবের দাম্পত্য জীবনের অতি সুন্দর উদাহরণ গীতগোবিন্দ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কদাচ ইহাকে বিকৃত প্রেম বলিয়া বোধ হইবে না। তিনি স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, একান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং প্রেমাভিনয়ে যথেষ্ট পটু ও হাস্যরসবিশারদ

ছিলেন ইহাই প্রতীত হইবে—ভাবনা-চিন্তা-বিহীন সুন্দর দাম্পত্য-জীবনের উদাহরণই গীতগোবিন্দে পরিস্ফুট।

জীবনচরিতের নির্ম্মল অংশে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে ঘৃণা হয় কিন্তু কথাটার মূল্য কিছু আছে কিনা একটু তলাইয়া দেখা দরকার। তাঁহার জীবনচরিতের পাঠক দেখিবেন যে কি বাহ্যিক ও কি আভ্যন্তরিক উভয়বিধ প্রমাণের মধ্যে কোনটাই এই অসমসাহসিক কথার সমর্থন করে না। জয়দেব তাঁহার কাব্যের মধ্যে কয়েকবার পদ্মাবতী নামের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু পদ্মাবতী কে সে পরিচয় নাই। পূজারি গোস্বামীর উৎকৃষ্ট টীকায় সর্ব্বত্রই পদ্মাবতী শব্দের শ্রীরাধা অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য অনেক টীকায় তৎপত্নী অর্থও গৃহীত হইয়াছে কিন্তু কুত্রাপি উপপত্নী বা পরকীয়া নারী এ অর্থ নাই। ভক্তমালা ও জয়দেব চরিত্রীতে লিখিত উভয় জীবনীতেই তাঁহার বিধিমতে বিবাহের কথাই লিখিত আছে এবং উভয় স্থানেই লিখিত আছে যে তিনি দীন হীন দরিদ্র বেশে বাস করিতেন সেই অবস্থায় কন্যার পিতামাতা বিশেষ অনুরোধ সহকারে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। উৎকল ও বঙ্গে তাঁহার নামের সহিত জড়িত যত কিম্বদন্তী পাওয়া গিয়াছে কোনটাতেই বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন কথার সমর্থন করে না, বরং পদ্মাবতীর পতিভক্তি প্রভৃতি গল্পে বিবাহের কথাই সুসিদ্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু এ কুৎসার সৃষ্টি কোন স্থান হইতে হইল? কুৎসার সৃষ্টি সর্ব্ব প্রথম উৎকল হইতেই হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধুরতায় উৎকল বাসীরা এক সময়ে পাগল হইয়া গিয়াছিল। তাহারা এজন্য জয়দেবের জীবনী ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষোত্তম যাঁহার পুস্তকে এত অনুরক্ত এবং যে পুস্তক তিনি স্বয়ং বক্ষে ধারণ করেন, তাহার লেখককে তাহারা

সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমের পূজারীরূপে দাঁড় করাইয়াছে। যে ব্যক্তি রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এ প্রকার গীত রচনা করিতে পারে, সে স্বয়ং গাহিতে পারে এবং নাচিতেও পারে সে কল্পনাও তাহারা করিয়াছে এবং তার সঙ্গে জয়দেবের বিবাহের কিম্বদন্তী মিশ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছে যে জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী উভয়ে নৃত্যগীত দ্বারা পুরুষোত্তমের তুষ্টি করিতেন।*

উড়িষ্যার সৃষ্ট গল্প সংস্কৃত ভক্তমালায় গিয়া স্থান পাইয়াছে। যাহাই হউক এই সৃষ্ট গল্পের মধ্যে দেবদাসী বা মন্দির বারাঙ্গনার উল্লেখ আদৌ নাই। কিন্তু পদ্মাবতী বিবাহিতা স্ত্রী একথা এ গল্প হইতে না লইয়া বাঙ্গালী সমালোচক নিজের প্রয়োজন মত ধরিয়া লইলেন যে মন্দিরে যখন দেবদাসী রাখার প্রথা ছিল এবং সেই অবিবাহিতা দেবদাসীগণ সাধারণতঃ যখন পূজারীদেরই সেবিকা হইত এবং গীতগোবিন্দের কবিতা যখন ইন্দ্রিয়োপভোগেরই স্পষ্ট মূর্ত্তি এবং যখন তাহা বারাঙ্গনা বা উপপত্নীতেই অধিকতর সম্ভব † তখন জয়দেবের পদ্মাবতী বারাঙ্গনা বা উপপত্নী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমালোচক হয়ত মনে করিলেন যে জয়দেব বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণবেরা বিবাহ না করিয়া সেবাদাসীই রাখিত; অধিকন্তু পত্নী হইলে এক সঙ্গে নাচিবে কেন? আর যখন পদ্মাবতীর পিতা মানসিক শোধ করিবার জন্য তাহাকে জগন্নাথেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তখন সে দেবদাসী না হইলে কি হইতে পারে? কথাটা গীতগোবিন্দের অশ্লীল অংশের সঙ্গে এমন লাগ হইয়া ও জমাট বাঁধিয়া গেল যে অনেক পাঠকের

* উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চনতৎপরৌ॥
সংস্কৃত ভক্তমালা। বাঙ্গালা ভক্তমালায় একথা পাইলাম না।

† পত্নীর গুণাবলীর মধ্যে "শয়নেষু বেশ্যা" একথাও হিন্দুর পুস্তকে উক্ত হইয়াছে।

মন বেশ সরস হইয়া উঠিল এবং ইহার পোষকতার জন্য গল্পও জমিতে লাগিল। তারপর এই ঘটনার সঙ্গে আজকাল সহজ ভজন ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের তাল এক হইয়া যাইতেছে।

পদ্মাবতীকে তাঁহার পিতার জগন্নাথকে সমর্পণ করিয়া দেওয়াই যদি তাঁহাকে বারাঙ্গনা বলিয়া পরিচিত করিবার কারণ হয় তবে ঐ কিম্বদন্তীর মধ্যে ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে পদ্মাবতীর পিতা শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইবামাত্রই জগন্নাথ আদেশ দিয়াছিলেন যে ঐ কন্যা জয়দেবকে অর্পণ কর, এবং হয়ত মন্দিরে প্রবেশ পর্য্যন্ত না করাইয়াই তাঁহাকে জয়দেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিধিমতে তাঁহাদের পরিণয় ক্রিয়াই সম্পাদন করান হইয়াছিল। সমালোচকগণ নিজের আবশ্যকমত কথাগুলি বাছিয়া লইবেন আর এটুকু ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? এটুকু অসত্য আর বারাঙ্গনার কথাটাই ধ্রুবসত্য এ যুক্তির সারবত্তার বিষয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

দেবদাসী প্রথা ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরে ছিল এবং জগন্নাথে বা অন্য কোথাও অদ্যাবধি আছে। শুধু ভারতবর্ষে নহে, প্রাচীন গ্রীক সাম্রাজ্যের অনেক মন্দিরে এতদপেক্ষা ঘৃণিত প্রথার বিষয়ও শুনা গিয়াছে। কি কারণ বশতঃ ভারতবর্ষে এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা যায় না। পিতামাতা হয়ত মানসিক করিয়া কন্যাকে দেবদাসী করিয়া দিত কিন্তু যখন ইহা কুপ্রথা বা ইহার ঘৃণিত অবস্থা লোকে চাক্ষুষ দেখিতে লাগিল তখন কোন হৃদয়বান পিতা কন্যাকে এ ভাবে ছাড়িয়া দিয়া যাইত বলিয়া মনে হয় না। বরং দেবতার নিকট ধরণা দিয়া ও প্রত্যাদেশ লইয়া হয় তাহার বিবাহ দিয়া যাইত, না হয় দেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া বিবাহ দিত। পদ্মাবতীর সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল।

জয়দেবের জীবনীর অনেক পাঠক দেখিতে পাইবেন যে জয়দেবের

জীবনকালের সঙ্গে উড়িষ্যার বা জগন্নাথের কোন সংস্রব ছিল কি না ইহাই বিশেষ সন্দেহস্থল। জয়দেব যে কখনও উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন বা জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিম্বদন্তী ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছুই নাই।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে পদ্মাবতীর সহিত বাস্তবিক পরিণয় সম্বন্ধই যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে কৃষ্ণার্চ্চনতৎপর হইয়া পত্নীর সহিত নৃত্য ও গীত, এ কি প্রকার প্রথা? কিন্তু এটী ভক্তমালার কথা, ভক্তমালা ভক্তদিগের অলৌকিক কাহিনীই প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন সত্যতা আছে কি না অনুসন্ধান করে নাই। এই ভক্তমালা তীর্থযাত্রীর মুখে মুখেই সংগৃহীত হইয়াছিল। যে উড়িয়া পাণ্ডা তীর্থযাত্রীকে এই গল্প শুনাইয়া দিয়াছিল সে বা তাহার পূর্ব্বের লোক অন্য কোন প্রমাণই পায় নাই কেবল "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" শব্দের প্রকৃষ্ট অর্থ সে গ্রহণ করিতে না পারিয়া আর একটা কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। পূজারী গোস্বামী বা কুম্ভের ন্যায় উৎকৃষ্ট অর্থ পরিহার করিয়া অনেক টীকাকার ঐ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যিনি পদ্মাবতী বা নিজ পত্নীর চরণের সঞ্চারণ বা চালনা অর্থাৎ নর্ত্তনকার্য্যে কুশল; অর্থাৎ যিনি নিজের পত্নী পদ্মাবতীকে নাচাইতেন। তবে এইটুকুই রক্ষা যে কৃষ্ণোপাসনার জন্য নাচানর কথাই রটনা হইয়াছে। জয়দেব বাঙ্গালী, কৃষ্ণোপাসনায় মগ্ন হইয়া কোন বাঙ্গালী স্ত্রী লইয়া কখনও নাচে নাই—উড়িয়ারা কিরূপ করে জানিনা। হাজার কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হউক, কি প্রাচীন যুগ বা কি নব্য যুগ, কোন সময়েই বাঙ্গালীর সমাজে এবম্ভূত উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এমন কি, চৈতন্যের যুগ, যখন বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমে মাতাল হইয়া গিয়াছিল তখনও স্ত্রী লইয়া এবম্ভূত ব্যবহারের বিষয় শুনা যায় নাই। জয়দেব, কবি ও

পণ্ডিত এবং মার্জ্জিতরুচি, বহু শাস্ত্র, বহু কাব্য ও বহু পুস্তকের অধ্যয়নে আপনার মনকে মার্জ্জিত করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং নাচিতে পারেন কিন্তু তা বলিয়া স্ত্রীকে লইয়া যে দেশাচারবর্জ্জিত কার্য্য করিবেন সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যদি বলি তিনি মহাপুরুষ, লোকের সমালোচনাকে গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনীর মধ্যে এমন কোনই পরিচয় নাই যে, তাঁহার এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ ছিল। তিনি বাঙ্গালীর সমাজের মধ্যস্থ সাধারণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন। হয়ত কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, পরমহংসের ন্যায় ভাবুকও ছিলেন না, চৈতন্যের ন্যায় তন্ময়ও ছিলেন না। যদি পদ্মাবতীকে বারাঙ্গনা বা দেবদাসী বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা না থাকে তাহা হইলে এরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া লইতে পারেন, কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা হইলে ইহাও কল্পনা করিতে হইবে যে সে বারাঙ্গনা নিকৃষ্টাদপি-নিকৃষ্ট-চরিত্রা তাহার লজ্জার কোন অস্তিত্ব ছিল না, কারণ সে (সেখ শুভোদয়ার মতে) লক্ষ্মণসেনের সভাতেও নাচিতে কুণ্ঠিত হয় নাই বা হয়ত ভিখারিণীর ন্যায় জয়দেবের সহিত দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া নাচিতেও তাহার আপত্তি ছিল ছিল না। একজন অতি মার্জ্জিত রুচি কবি বা লেখক (হাজার কৃষ্ণভক্ত হউন) মরিয়া যাইবেন তত্রাপি এ প্রকার প্রথা অবলম্বন করিবেন কিনা পাঠক বিচার করিয়া লইবেন। আর কৃষ্ণভক্তি প্রকটিত করিবার জন্য পরের দুয়ারে নাচিবারই বা তাঁহার প্রয়োজনীয়তা কি? পদ্মাবতীচরণ-চারণ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করাই যে এ কিম্বদন্তীর মূল তাহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। কথাটা একটু বিশদ করিবার জন্য এ এ বিষয়ে আমাকে আরও একটু লিখিতে হইতেছে। হিন্দুর সকল গ্রন্থেই দেবদেবতার নাম করিয়া মঙ্গলাচরণ লিখিত হইবার প্রথা আছে। গীতগোবিন্দ কাব্যের সর্ব্বপ্রথমেই (২য় শ্লোকে) যে মঙ্গলাচরণ লিখিত

হইয়াছে সেই শ্লোকেই পদ্মাবতীচরণচারণ শব্দের প্রযোগ হইয়াছে। শ্লোকটীকে গ্রন্থের মধ্যে বা অন্য কোথাও পাওয়া গেলে সন্দেহ হইতে পারিত কিন্তু হিন্দুর গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথমেই দেবতার উল্লেখের পরিবর্ত্তে কোন সেবাদাসীর নর্ত্তনকার্য্যকুশলতার পরিচয় অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব। উক্ত সেবাদাসীর নামের সঙ্গে আবার দেবতার নামেরও সংমিশ্রণ! ফুট নোটে ঐ শ্লোকটী লিখিত হইল, সেবাদাসী ঘটিত অর্থের অনুবাদ আমি লিখিয়া দিতেছি, কেমন অদ্ভুত সামঞ্জস্য বা association of ideaর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাঠক দেখিবেন।

অনুবাদ। যাঁহার চিত্তরূপ গৃহ বাগ্‌দেবতার (দেবী সরস্বতী অথবা দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণের) চরিত দ্বারা চিত্রিত, যিনি (তাঁহার সেবাদাসী অথবা মতান্তরে তাঁহার পত্নী) পদ্মাবতীর নর্ত্তন কার্য্যের দক্ষতার নটসার্ব্বভৌম সেই জয়দেব নামক কবি শ্রীরাধা ও বাসুদেবের এই রতিকেলিকথাসমন্বিত প্রবন্ধ লিখিতেছেন; যদি হরিস্মরণে চিত্ত সরস থাকে, যদি বিলাসকলা সমূহের চর্চ্চায় কৌতুহল থাকেঁ, তবে (হে শ্রোতৃবর্গ) মধুর কোমল ও কান্তপদাবলী বিশিষ্ট জয়দেবের সেই প্রবন্ধ শ্রবণ কর।

ভগবানের নাম, বিষয়ের গাম্ভীর্য্য ও মঙ্গলাচরণের মধ্যে সেবাদাসীর অথবা মতান্তরে তাঁহার পত্নীর নর্ত্তনকুশলতার কথা কেমন সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে দেখুন। সুতরাং যে সকল টীকাকার ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের ব্যাখ্যা যে কত অকিঞ্চিৎকর সহজেই অনুমিত হইবে।

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা,
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত—
মেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্॥
যদি হরিস্মরণে ইত্যাদি—

পূজারি গোস্বামী বাগ্‌দেবতা অর্থে শ্রীকৃষ্ণ এবং পদ্মাবতী অর্থে শ্রীরাধা গ্রহণ করিয়াছেন। কুম্ভ বাগদেবতা অর্থে সরস্বতী এবং পদ্মাবতী অর্থে লক্ষ্মী গ্রহণ করিয়াছেন। উভয় অর্থই সুন্দর এবং গ্রন্থপ্রারম্ভের যোগ্য। চরণচারণচক্রবর্ত্তী অর্থ যিনি পদ্মাবতীর অর্থাৎ শ্রীরাধা কিম্বা লক্ষ্মীর পরিচর্য্যা বিশেষে চক্রবর্ত্তীস্বরূপ অথবা যিনি তাঁহার আরাধনায় নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নৃত্যাদির দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার আরাধনায় তৎপর।

পদ্মাবতী তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বলিয়া গ্রন্থের মধ্যে যেখানেই সেই শব্দ পাওয়া যাইবে সেই খানেই তাহার সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে কি? তবে ধ্বন্যাত্মক অর্থ থাকিতে পারে; সে অর্থ যদি কেহ লইতে চাহেন তবে পদ্মাবতীর পরিচর্য্যা বিশেষে চক্রবর্ত্তী বলিলেই হয়।

কুম্ভ তাঁহার টীকায় পদ্মাবতী অর্থে কলত্র বা জয়দেবপত্নী অনুমান করিয়া বিকৃত অর্থটীও দেখাইয়াছেন কিন্তু তজ্জন্য অনেক কৈফিয়ৎ তাঁহাকে যোগাইতে হইয়াছে যে ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রীই সহায় এবং যিনি মহৎ তিনি লোক লজ্জার ধার ধারেন না ইত্যাদি। যাই হউক যত টীকা আমরা দেখিয়াছি কোনটীতেই পদ্মাবতী অর্থে স্ত্রী ভিন্ন সেবাদাসী, বারাঙ্গনা বা দেবদাসী গৃহীত হয় নাই।

আর একটা কথা এই যে বৈষ্ণবেরা বিবাহ না করিয়া সেবাদাসীই সকলে রাখিত এ ধারণাও অনেকের আছে। ইহাও অশ্রদ্ধেয় কথা, কারণ জয়দেবের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা অতি আদিম, ধর্ম্ম তখন নিকৃষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। চৈতন্যযুগের অনেক পরে বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্মে পরকীয়া নারী জয়পত্র পাইয়া থাকিবে। পরকীয়া জয়পত্র লাভ করিলেও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাই সাধারণ বিধি ছিল ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না। গৃহী ও উদাসীন ভাগে বৈষ্ণব দুই শ্রেণীর। গৃহীদের মধ্যে এ বিধি ঘৃণ্য। গীতগোবিন্দ যে পড়িবে সেই সহজে উপলব্ধি

করিতে পরিবে যে জয়দেব গৃহী ছিলেন। গৃহে বসিয়াই কবিত্বের ঝঙ্কারে তিনি দিক মাতাইয়া গিয়াছেন। যে কবি সে আজি কালিকায় জগতের ন্যায়ই কবি, সে কখনও দ্বারে দ্বারে পত্নী বা প্রেমিকা লইয়া নাচিয়া বেড়ায় না। সে ঘৃণায় মরিয়া যাইবে, অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে, তত্রাপি সে আচরণে রাজী হইবে না। অন্নকষ্টও জয়দেবের ছিল না কারণ তিনি কোন রাজার আশ্রিত বা তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং যে প্রকার ভাবেই আলোচনা করা যাইবে একটু অনুধাবন করিলে ঘৃণিত অর্থ কখনই মনে আসিবে না।

গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম ও সমসাময়িক সমাজ চিত্র।

আধ্যাত্মিকতার আরোপ।

মনে হইতেছে বহু দিন পূর্ব্বে "সাধনা"র কোন একজন সুবিখ্যাত লেখক জয়দেবের লেখার সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহার গীতগোবিন্দকে কুভাবব্যঞ্জক, অন্তঃসার-বিহীন ও মানবমনের নিকৃষ্টবৃত্তি প্রকাশক প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গীতগোবিন্দের মধ্যে ধর্ম্মের ভাগ কতটুকু আছে এ বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সময় ইতস্ততঃ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার ধর্ম্মের কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া অনেক বঙ্গদেশীয় ব্যক্তির সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন গীতগোবিন্দ আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ।* আমাদের দেশীয় বৈষ্ণবগণ সকলকেই উপদেশ দিয়া থাকেন, অধিকারী না হইয়া এ পুস্তক পড়িও না। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ কাব্যামোদ ব্যতীত ধর্ম্মের কথা ইহার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিফলপ্রযত্ন হয়েন। ধর্ম্মপুস্তকের সঙ্গে গীতগোবিন্দ স্থান পাওয়াতে ইহার মধ্যে ধর্ম্মের ভাগ কতটুকু থাকিতে পারে, সকলেরই মনে বোধ হয় কোন না কোন সময়ে এ সন্দেহ উদিত হইয়াছে।

এক কথায় এ সন্দেহের উত্তর কেহ দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আমি এ পর্য্যন্ত সাহিত্যানুরাগী দুই একটী ব্যক্তি ও বৈষ্ণবধর্ম্মের

---

* A. A. Macdonell তাঁহার History of Sanskrit Literature নামক আধুনিক পুস্তক লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বই জয়দেবের অভিপ্রেত হইবে।

কুসংস্কারমুক্ত দুই একটী সদ্ বৈষ্ণবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্দেহ ভঞ্জন হয় এমন কোন উত্তর প্রাপ্ত হই নাই।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের কতকগুলি লোকের প্রকৃতি এইরূপ যে যেখানেই তাঁহারা কোন ধর্ম্ম বা শাস্ত্রীয় কথার চর্চ্চায় কোন সন্দেহে উপনীত হয়েন, সেইস্থানেই তাঁহারা সেই বিষয়ের দেশ কালাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিযা থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিসই নাই যাহার কোন না কোন উপায়ে আধ্যাত্মিক অর্থ না করা যাইতে পারে; সুতরাং নিজের মনের মত কোন একটা বিষয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলেই আর কতকগুলি লোক মনে করে, এইটীই প্রকৃত ব্যাখ্যা। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক জিনিষেরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এ কথা কি কখনও কাহারও মনে উদিত হয় না যে সেকালের হিন্দুগণ যাহা কিছু লিখিতেন সকল জিনিসের মধ্যেই একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রাখিয়া দিতেন? দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, সকল বিষয়েই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব! অবশ্যই ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

সমাজের শৈশবাবস্থা হইতে পরিণতাবস্থা পর্য্যন্ত সাহিত্যের ও চিন্তার ক্রমোন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় ও চিন্তার প্রথম স্তরে আধ্যাত্মিক কোন জিনিষই পাওয়া যাইতে পারে না। ভাষার ও ভাবের দ্ব্যর্থ, মস্তিকের কুট-বুদ্ধি অথবা সাহিত্যের পরিণতাবস্থার ফল। মানবের প্রথম সাহিত্য সরল, সরস মনোভাব বা সৌন্দর্য্যের স্বতঃস্ফূর্ত্তি কিংবা সরল সহজ কথায় লোকশিক্ষার চেষ্টা মাত্র। যেখানেই আমি আধ্যাত্মিকতার অবতারণা করিয়াছি সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে আমি

লোকশিক্ষা হইতে দূরে থাকিতে চাই, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, আমারই বিস্তার অথবা প্রকাশ মাত্র। আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে কবিত্ব ও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য দুইই নষ্ট হইয়া যায়। যদি মানিয়া লই হিন্দুর যে কিছু পুস্তক এখন আছে, সবই আধ্যাত্মিকতত্ত্বসমন্বিত, তবে এ কথা কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে, হিন্দুর চিন্তার ক্রমবিকাশের সর্ব্বপ্রথম ও মধ্যাবস্থায় যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল? তাহার চিহ্নমাত্রও কি এ পৃথিবীতে নাই? যেখানেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা, সেই খানেই সাহিত্য অসরল। সরল কথা, সহজ ভাব ও সত্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কোন রকমেই স্থান পাইতে পারে না। খুব সুদক্ষ লেখক সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত পরিণতাবস্থায়, হয়ত লেখার একটু অংশে একটা আধটা ভাবের নিম্নে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে রাখিয়া দেন; আদ্যোপান্ত আধ্যাত্মিকতা সে লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না, আর অন্তর্নিহিত সেই আধ্যাত্মিক ভাবটুকু লইয়া মানবমন তোলপাড় করিতে থাকে, তাহার ক্ষমতা প্রবল। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে বেশী নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় বা Pilgrim's Progress এর মধ্যে যে রূপক কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব আছে, দৃষ্টিমাত্রেই পাঠক বুঝিতে পারিবে যে সেই টুকু বর্ণনার জন্যই লেখকের প্রাণপণ চেষ্টা; সুস্পষ্ট ভাষায় সেই বিষয় বিশদ করা অপেক্ষা রূপকছলে তাহার বর্ণনা যে বিশেষ ফলপ্রদ হয় তাহা বোধ হয় না। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সাহিত্যের মধ্যে যেখানেই আমি আধ্যাত্মিকতার আরোপ করিতে চাই, সেই স্থানেই আমি গবেষণা দ্বারা সে বিষয়টী বিশদভাবে বুঝিতে চাহিনা। বস্তুতঃ হিন্দুর কাব্য বা সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা অতি অল্প। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কাহারই লেখায় আধ্যাত্মিকতা নাই, কেবল জয়দেবের বেলাই আধ্যাত্মিকতা! তাহার কারণ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ অতি

সুন্দর উচ্চশ্রেণীর কাব্য, তাহাকে ফেলিতে পারি না আবার জয়দেবের মধ্যে যে অশ্লীলতার বর্ণনা আছে তাহাই বা কি করিয়া সমর্থন করি সুতরাং দুই দিক রাখিতে গেলে ইহাকে আধ্যাত্মিক না বলিলে সব গোলমাল হইয়া যায়।

গীতগোবিন্দ বোধ হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় গ্রন্থ*। জয়দেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের মধ্যে আর কোন বৈষ্ণব বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বৌদ্ধ-নাস্তিকতা-বিদ্ধস্ত বঙ্গদেশে শৈবধর্ম্ম প্রচারের পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল ঐতিহাসিক আলোচনায় সাধারণ কথা এইটাই পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রথম অবস্থার বৈষ্ণবগ্রন্থ লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য দূরে রাখিয়া যে অযথা আধ্যাত্মিকতা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া আপনাকে লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য করিতে প্রয়াস পাইবে ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহাদের ধর্ম্মের মধ্যে একটা গূঢ় কথার স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বরোপাসনার জন্য ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের গাঢ়তা, ব্যাকুলতা ও মাদকতাই তাঁহাকে প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। যেমন পরকীয়া নায়িকার প্রেমে তাহার প্রেমিকের জন্য ব্যাকুলতা ও উন্মত্ততা দেখা যায়, রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি প্রেমও তেমনি ব্যাকুলতা ও মাদকতাময়। এই ব্যাকুলতার পরিণাম হরির সহিত মিলন। চৈতন্যদেবের সময় হইতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজ এই মধুর ভাবের উপাসনায় তৎপর; চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির সমসাময়িক কালেও এই উপাসনা

* কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক যে গ্রন্থ আবিষ্কার হইয়াছে সাহিত্য পরিষদের পণ্ডিতগণ গীতগোবিন্দের পূর্ব্বে তাহার কাল নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ দেশের মধ্যে পরিচিত ছিল না। থাকিলে কোন অজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া এত কাল পরে প্রকাশিত হইত না।

নীতির উন্মেষ হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু ইহার বিকাশ ও পুষ্টি চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী সময় হইতে তাঁহারই জীবনের তন্ময়তা ও উদাহরণ লইয়া।

এই ব্যাকুলতা-মাদকতাময় মধুর ভাবের বা রাধাভাবের উপাসনারূপ আধ্যাত্মিকতা বা মালার ন্যায় একটী সূত্র গীতগোবিন্দের মধ্যে আছে, বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ইহাই বুঝাইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ যদি এই আধ্যাত্মিকতাই গীতগোবিন্দের ধর্ম্মের মূলনীতি হয় তবে এতদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্টভাবব্যঞ্জক একখানি নভেল বা অন্য কাব্যও ধর্ম্মের আদর্শস্থানীয় হইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনটীই তাহা হয় নাই। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও মুসলমান-সাহিত্যে প্রেমের এতদপেক্ষা আরও অধিক তন্ময়তা এবং আত্মবিসর্জ্জনের চিত্র আছে কিন্তু কোনটীই ধর্ম্মপুস্তকের পদপ্রান্তেও স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই।

গীতগোবিন্দে যদি এই আধ্যাত্মিকতা থাকে তবে জয়দেব স্বয়ং ইহা জানিতেন কি না, বা স্বয়ং ইহার আরোপ করিয়াছিলেন কি না, বা তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়কে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন কি না, তাহা সমূহ সন্দেহ-জনক। জয়দেব স্বয়ং যদি ইহার আরোপ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার পুস্তকের সেই অশ্লীল অংশ বা বিহার বর্ণনার কথা ছাড়িয়া দিয়াও ত অতি সুন্দর ভাবে তন্ময়তা, গাঢ়তা ও ব্যাকুলতার আদর্শ গঠন করিতে পারিতেন?

গীতগোবিন্দ কোন উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য প্রণীত হইয়াছিল সে কথা পরে আলোচনা করিব। সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়া ইহা যখন কালক্রমে ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অংশীভূত হইয়াছে, তখনই বৈষ্ণবসম্প্রদায় সে উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন না করিয়া, ইহার মধ্যে ধর্ম্ম কি তাহাই অন্বেষণতৎপর হইয়া এই আধ্যাত্মিকতার আরোপ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই গীতগোবিন্দ পঠিত হয় কিন্তু ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কি

তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কেহই অনুসন্ধান করেনা। এমন কি, যে উৎকলের লোক জয়দেবকে নিজের দেশের লোক বলিয়া দেশ বিদেশে রাষ্ট করিয়া দিয়াছে, যে উৎকলে রাজকীয় বিধানানুযায়ী গীতগোবিন্দ জগন্নাথের মন্দিরে নিয়মিতরূপে পঠিত ও গীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই উৎকলবাসীরাও ইহার আধ্যাত্মিকতার কথা বা এবম্ভূত মধুর ভাবের কথা জানে না।

রাণা কুম্ভের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকায় সকল কথারই আলোচনা হইয়াছে, তিনিও ইহার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। এবং পূজারিগোস্বামী বা অন্যান্য ৫।৭ জন টীকাকার, যাঁহাদের পুস্তক আমরা দেখিয়াছি তাঁহারাও কেহ ইহার উল্লেখ করেন নাই।

ইউরোপীয় অনুবাদক ও সমালোচকগণ বাঙ্গালীর সমালোচনারই প্রতিধ্বনি গাহিয়া থাকেন। এত বড় একটা বিষয়ে স্বাধীন মত প্রায় কেহ প্রকাশ করেন নাই।

সময় নিরূপণ ঃ—

(ক) ভারতীয় ধর্ম্মান্দোলনে।

যদি ইহাতে আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে কেন ইহা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে? এ আপত্তির উত্তরে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গীতগোবিন্দ কাব্য কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের কোন কবিরই সময়নিরূপণ সুসাধ্য নহে। গীতগোবিন্দও যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা কোন ইতিহাসলেখক বা সমালোচকই আজ পর্য্যন্ত স্থির করিতে সক্ষম হন নাই। যাহাতে এ বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারে এরূপ বাহ্যযুক্তি আজ পর্য্যন্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেহ কাশ্মীর, কেহ রাজপুতানা, কেহ নোয়াখালি প্রভৃতি কোন স্থানে কোন একটা

পুরাতন পুস্তকে "জয়দেব" নাম দেখিয়া জয়দেবের সময় নিরূপণ করিতে বসিয়াছেন কিন্তু সবগুলির আলোচনা করিলে একটীকেও স্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া বোধ হয় না। মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় আসল গ্রন্থ সেকালে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকিত। জয়দেবের কাব্যের নূতনত্বে তাঁহার কাব্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল, এজন্য প্রাচীন কোন পুস্তকে বা গাথায় যদি জয়দেবের নাম পাওয়া যায় তাহা হইলে জয়দেবের গুণগ্রাহী কোন পুস্তকনকলকারী যে ঐ নাম সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন সে সন্দেহ আসিয়া পড়ে।

গীতগোবিন্দকে লোকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া বিশ্বাস করে; কিন্তু গীতগোবিন্দের আবিষ্কৃত ধর্ম্ম প্রাচীনকালের কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ নূতন ধর্ম্ম কোন একটা উদ্দেশ্যে বা বিশেষ কোন সামাজিক কারণ বশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হয়। এই কারণ কি, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এ বিষয় কতকটা স্থিরীকৃত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

লাসেন্ সাহেব জয়দেবকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলেন; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সেই মতাবলম্বী।* হাণ্টার সাহেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে জয়দেবের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। আবার এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব জয়দেবকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর

* Macdonell ও এই মতাবলম্বী :—

'The transitional stage between pure lyric and pure drama is represented by the Gitagovinda, a lyrical drama, which, though dating from the twelfth century, is the earliest literary specimen of a primitive type of play that still survives in Bengal, and must have preceded the regular dramas.

A History of Sanskrit Literature. p 344.

লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখনকার প্রচলিত মত এই যে তিনি লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন। প্রথমোক্ত মতগুলির অর্থ ও ইহাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত লইয়া ইতিহাসে সন্দেহ তাঁহার সময়ে জয়দেবের বর্ত্তমান-থাকা ত দূরের কথা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু সংস্কৃত ও পারসী গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১০৬ খৃঃ হইতে ১১৩৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময় বখতিয়ার খিলিজি বঙ্গবিজয় করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পৌত্র সুরসেন বা অশোক সেন, যিনি লক্ষ্মণিয়া বা লাক্ষ্মণেয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারই বৃদ্ধাবস্থায় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। এবং এই লাক্ষ্মণেয়ই ৮০ বৎসর (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিবর্ত্তিত মতানুসারে তদপেক্ষা কম) জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের যে সকল ইতিহাস কিছু পূর্ব্বের তাহাতে এই কথা আছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ইতিহাস বাহির হইতেছে তাহাতে এ সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মতে লক্ষ্মণসেন ও লাক্ষ্মণেয় একই ব্যক্তি। এ মতে ১১৯৮ অথবা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার বঙ্গ জয় করেন এবং লক্ষ্মণসেন ১১১৯ খৃঃ হইতে আরম্ভ করিয়া তদবধি তাঁহার রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উভয় মতেই জন্মদিন বা মাতৃগর্ভ হইতেই রাজ্যশাসনের কিম্বদন্তী আছে। লক্ষ্মণসেন লসং নামক একটী অব্দ প্রচলিত করেন। উভয় বিবরণ হইতেই পাওয়া যায় যে লসং তাঁহার জন্ম তারিখ হইতেই আরম্ভ। একটী মতে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে লসং আরম্ভ, অন্য মতে ১১১৯ হইতে। প্রথম মতানুসারে জয়দেব পূর্ব্বের লক্ষ্মণ সেনের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মতে লক্ষ্মণসেন ও লাক্ষ্মণেয় উভয় অংশ একীভূত করিয়া যে রাজত্ব কাল সেই সময়ে জয়দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইতিহাসের এবম্ভূত

সত্যের* মধ্যে কোন বিষয় স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং যখন লক্ষ্মণ সেনেরই স্থিরতা নাই এবং আর দশ বৎসরের মধ্যে হয়ত আর একটা নূতন কিছু আবিষ্কার হইবে তখন জয়দেবকে তার সঙ্গে জড়াইয়া রাখার সত্যতাও যে কত দৃঢ় তাহা অনুমিত হইতে পারে।

* ইতিহাসের আরও রহস্য অনুধাবন করুন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের মূল্য যে কত তাহা বুঝা যাইতে পারিবে। একটী মতে বীরসেন বা আদিশূরের পুত্র, সামন্তসেন, তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন, হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন), এবং বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন।

অন্যমতে সামন্তসেন সেনবংশের আদিপুরুষ, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গঙ্গার ধারে উপনিবেশ করেন, তাঁহার পৌত্র হেমন্তসেন (পুত্র নহেন), হেমন্তসেনের পুত্র বল্লালসেন (পূর্ব্ব মতানুযায়ী তাঁহার পৌত্র নহেন। পৌত্র পুত্রে এবং পুত্র পৌত্রে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু প্রাচীন তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে, এই পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাতে লিখিত হইয়াছে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সামন্তসেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহা হইলে, তাঁহার প্রপৌত্র বল্লালসেন ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে কেমন করিয়া দানসাগর গ্রন্থ রচনা করিলেন, (দানসাগর গ্রন্থেই অবশ্য তারিখ লেখা আছে)। পুনশ্চ লিখিত আছে যে সামন্তসেনের পৌত্র হেমন্ত সেন বঙ্গদেশে স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন, তারপর বল্লাল সেন রাজত্ব করিয়াছেন এবং তিনি মরিয়া গেলে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে লসং আরম্ভ—অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে উপনিবেশ স্থাপন ও সেই প্রথমাংশেই লক্ষ্মণ সেনের জন্ম আর সেই ১৯ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ সামন্ত সেনের উপনিবেশ ও লক্ষ্মণ সেনের জন্মের মধ্যে তিনজন রাজার রাজ্য কাল গড়ে প্রায় ছয় বৎসর করিয়া। এই ১৯ বৎসরের মধ্যে রাজ্য আরম্ভ ও বল্লালসেনের সময় তাহার চরম সীমায় আরোহণ!

আবার শুনিতে পাওয়া যায় বল্লাল সেন প্রায় ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক লক্ষ্মণ সেন এক ব্যক্তিই হউন বা তদনুরূপ নামধারী দুইজন * ব্যক্তিই বঙ্গদেশে থাকুন, এই সময় যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১১০০ খ্রীঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত, তাহার সম্বন্ধে কোন গোলমাল পাওয়া যাইতেছেনা। এবং এই সময়টীর মধ্যে কোন সময়ে জয়দেব বর্ত্তমান ছিলেন ইহাই বর্ত্তমানকালের সাধারণ মত। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশের যত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ সেনের † কথা যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার ৮০ বৎসর রাজত্বকালের অন্য কোন কথা লিখিত না থাকুক, প্রত্যেক ইতিহাসেই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের ন্যায় জয়দেবের নাম সংযুক্ত হইয়াছে। রামলক্ষ্মণ, রাধাকৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুন ও সীতারামও যেমন এক সঙ্গে চলে লক্ষ্মণসেন জয়দেবও বর্ত্তমান ইতিহাসে

---

* সুবল চন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত অভিধানে লিখিতেছে,- "লক্ষ্মণ সেন নামে বঙ্গদেশে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম জন সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল সেনের পুত্র। ১১১৯ খৃঃ হইতে লক্ষ্মণ সংবৎ ইহাঁরই সময় হইতে আরম্ভ। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ইহাঁর সভায় বর্ত্তমান ছিল এবং জয়দেব ইহাঁর সভায় থাকিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ের নিকট লক্ষ্মণাবতী নামে নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনও উক্ত বংশে উৎপন্ন। ইনি এই বংশের শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্ব কালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। ইহাঁরই সময় বখ্‌তিয়ার মগধ জয় করেন এবং পরবৎসর বঙ্গ বিজয় করেন।

৮০ বৎসর রাজত্ব কালের প্রবাদ এখানে টিকে না।

† এই সেনবংশের পরিচয় বাঙ্গালার ইতিহাসে এখনও একেবারে প্রচ্ছন্ন। এই বংশের জাতি,ধর্ম্ম, রাজাদের নাম, রাজত্বকাল, এখনও কিছুই স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের কেহ বলে (Vincent Smith) ব্রাহ্মণ, কেহ বলে বৈদ্য, কেহ বলে কায়স্থ। যে বংশের ইতিহাসের এই অবস্থা, জয়দেবকে সেই বংশের সহিত গাঁথিয়া দেওয়ার সত্যতাও তদ্রূপ। বল্লাল সেনের কৌলিন্য স্থাপন এবং লক্ষ্মণ সেনের বঙ্গবিজয়- এই দুইটী ছাড়া সেনবংশের আর কোন বিশিষ্ট সত্য ঘটনা বোধ হয় পাওয়া যায় নাই।

তদ্রূপ। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালের মধ্যে ইতিহাস লেখকগণ আর কিছু মাত্র কথা পায় না। যেন জয়দেব ব্যতীত লক্ষ্মণ সেনের ইতিহাসে আর কিছুই নাই।

স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের ন্যায় ইতিহাসের এবম্ভূত তথ্য প্রচারের সম্মুখে, জয়দেবের সময় সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, বলিয়া রাখা উচিত যে জয়দেব নামক অনেকগুলি লেখক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সবিশেষ আত্মপরিচয় না থাকা ও ইতিহাস দুর্লভ হওয়ায় উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে যে না আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। গীতগোবিন্দকার জয়দেব ব্যতীত প্রসন্নরাঘবকার জয়দেবও বিশেষ বিখ্যাত। একজন মৈথিল কবি জয়দেবের নামও শুনা গিয়াছে। ইনি পক্ষধর মিশ্র কি না বলা যায় না। আবার রতিমঞ্জরী নামক যে গ্রন্থ আছে তাহারও লেখক জয়দেব কিন্তু ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত যে গীতগোবিন্দকার জয়দেব কখনই তাহার লেখক হইতে পারেন না—কারণ বটতলার উপন্যাস ও বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস যে কোন পাঠকই চিনিতে পারে। আবার "শৃঙ্গারমাধবীয়চম্পূ" প্রণেতা এক জয়দেবের নামও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। এত জয়দেবের মধ্যে গীতগোবিন্দকার জয়দেবই যে লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন তাহার সম্বন্ধে শক্ত প্রমাণ কিছুই নাই।

যাহাই হউক, গীতগোবিন্দকার জয়দেবের সময় সম্বন্ধে যে পৃথক্ পৃথক্ মত পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত (১১০০ খৃঃ হইতে ১৫০০ খৃঃ পর্য্যন্ত) সময়ের মধ্যে কোন সময়ে জয়দেব বর্ত্তমান ছিলেন। জয়দেবকে ইহার পূর্ব্বের বা পরের লোক এ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। বলিলে, বহু কারণবশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। ১৪৮৫ খৃঃ হইতে ১৫২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের জীবনকাল। অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে চৈতন্যদেবের

কাল পর্য্যন্ত কোন সময়ে জয়দেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—এটুকু কথা সুসিদ্ধ হইয়াছে, মতদ্বৈধ নাই।

এই যে চারিশত বৎসর ইহা অবশ্য একটু সামান্য সময় নহে। থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটা যুদ্ধে মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়া পাণিপথের আর একটা যুদ্ধে সে সাম্রাজ্যের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে; কাবুল হইতে বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পুনরায় ভাঙ্গিতে কত দিনই চলিয়া যায় ও কত বড় বড় ইতিহাসই প্রণীত হইতে পারে। এই বিস্তৃত সময়ের হিন্দুর ধর্ম্মমত একটু অনুসন্ধান করা উচিত, কারণ জয়দেব একটী বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পৃথিবীর এই নিয়ম, যে ধর্ম্মের অবনতির জন্যই নূতন ধর্ম্ম গঠিত হইয়া থাকে।

সকলেই অবগত আছেন যে এক সময়ে ভারতবর্ষে একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ছিল; অন্যান্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সকলগুলিই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তারপর হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইল। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়া শৈবধর্ম্মের জীবন দান করিলেন—ইহা খ্রীঃ নবম শতাব্দীর চেষ্টা। বিষ্ণুর নাম তখন পর্য্যন্ত কেহ করিল না এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও হইল না; এমন কি, কথিত আছে যে বিষ্ণুভক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি কাশীর রাজা গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামানুজ স্বামীই প্রধান। ইনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই কথিত।

উইল্কস্ প্রণীত মহীশূরের ইতিহাসে স্থিরীকৃত হইয়াছে (রামানুজ স্বীয় দেশ চোলরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মহীশূর রাজ্যেই তাঁহার ধর্ম্মমত দৃঢ় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন) যে রামানুজ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ও

ভাগবত অবশ্য তাহার পূর্ব্বে প্রচলিত থাকাই সম্ভব এবং বিষ্ণুর (চতুর্ভুজ বিষ্ণুর) উপাসনা তাহারও বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু রামানুজ স্বামীর দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এবং শঙ্করাচার্য্যের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের যে প্রকার অপ্রতিহত প্রভাব তাহাতে বিষ্ণু যে ভারতবর্ষের গূঢ় কোণে লুক্কায়িত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, জগন্নাথ প্রভৃতি হিন্দুর বড় বড় তীর্থই বহুকাল ধরিয়া বৌদ্ধদিগের কেন্দ্রস্থল। যে মথুরায় বিষ্ণুর রাজত্ব সেই মথুরা তখন বৌদ্ধদেরই একটী প্রধান স্থান। আজকাল সেই বৌদ্ধ মন্দির বা বৌদ্ধ স্মৃতির উপর হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র। জগন্নাথ, গয়া, মথুরা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য।

রামানুজ স্বামী লুপ্তপ্রায় সেই বৈষ্ণবধর্ম্মকে বাহিরে আনিলেন। অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন দুর্দ্দান্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সম্মুখে রামানুজের পূর্ব্বে (প্রতিদ্বন্দ্বী শৈব ধর্ম্মেরই পার্শ্বে) বৈষ্ণব মত প্রচারিত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। তাই, যখন শৈব মতের সঙ্গে প্রায় তিন শত বৎসর যুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকটা হতবীর্য্য হইল তখনই রামানুজ অবতীর্ণ হইলেন এবং বৈষ্ণবমত দৃঢ়ভাবে প্রচারের আয়োজন হইল। রামানুজের ভক্তিমার্গ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শৈব, জৈন ও মরণোন্মুখ বৌদ্ধ তিন ধর্ম্মেরই প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে এক বিশেষ গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল।

শঙ্করাচার্য্য নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সকলেরই বোধ হয় একটা বিশ্বাস আছে এবং প্রত্যেক ইতিহাসেই এই একটা কথা ব্যক্ত করে যে শঙ্করাচার্য্যই বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেড় হাজার বৎসর

ভারতবর্ষে সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে, অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি কত বড় বড় সম্রাট যে ধর্ম্মকে দৃঢ়তররূপে সংস্থাপিত করিবার জন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের একটা ক্ষুদ্র জীবনেই সেই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া গেল! আশ্চর্য্য কথা। দশ কি বিশ বৎসরে দেড় হাজার বৎসরে গঠিত এত বড় একটা বিরাট জিনিস ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা—ঐতিহাসিকের যুক্তি কেমন করিয়া ইহা বিশ্বাস করিতে পারে বুঝি না। কুমারিল বা শঙ্করাচার্য্যের কথাই ইতিহাস বেশী করিয়া বলে, কিন্তু তাঁহাদের পর আরও যে ছয় কি সাতশত বৎসর প্রয়োজন, সে ছয় সাত শত বৎসরের কথা সাধারণ ইতিহাস প্রায় বলিয়া দিতে চাহে না। আজ যদি কোন মুসলমান বা খ্রীষ্টান পাদ্রী, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মযুদ্ধে হিন্দুদের হারাইয়া দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল বুঝিতে হইবে কি? হুয়েন্থ সঙ্ যদি একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিতেন, তাহা হইলেও তিনি ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বোধ হয় বৌদ্ধ বিহার, শ্রমণ, ভিক্ষু আদির পূর্ণ প্রভাব না হউক কতকটা দেখিতে পাইতেন। এবং বোঁধ হয় অনুভব করিতেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে তখনও আছে, কেবল নদী আর ভাদ্র মাসের মত তত গভীর গম্ভীর ও মন্থর স্রোতে চলিতেছে না, আশ্বিনের খরটান আরম্ভ হইয়াছে, দুদিন পরে শুকাইয়া যাইবে। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে হিন্দুর মনে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল এবং শৈব মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধ বিহার ভাঙ্গিবার আয়োজনও হইতেছিল। এই ভাবে শৈব ধর্ম্ম বর্দ্ধিতায়তন হইলে বৈষ্ণবধর্ম্ম তদ্রূপ উদ্দেশ্যে, অধিকন্তু শৈবধর্ম্মেরও বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল। রামানুজ এই পন্থার প্রথম নায়ক বা অবতার।

যখন বৌদ্ধ বিজিত হইল, এবং ভারতবর্ষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবার

উপক্রম হইয়া আসিল, যখন আর সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই, তখন শৈব ও বৈষ্ণব আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিল। আজ এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নূতন চিন্তার স্রোতে নূতন জগতের নূতন ভাব মধ্যে মগ্ন হইয়া সে মহা-সংগ্রাম নিবিয়া গিয়াছে।

রামানুজের ভক্তিমার্গ একদিনেই ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া যায় নাই। কোন মত প্রচলিত হইতে বহু দিন লাগে, বিশেষতঃ ধর্ম্মরূপ প্রলোভন শূন্য শুষ্ক মত। আজিকার একদিনের পথ তখন মানুষে এক বৎসরেও চলিতে পারিত না। দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশে তখন বহুদিনের ব্যবধান ছিল। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যে মত প্রচারিত হইয়াছে, টেলিগ্রাফ্, রেল বা সংবাদ পত্রের দ্বারা তাহা এক দিনেই অপর প্রান্তে ধ্বনিত হইত না। তীর্থযাত্রীর মুখে, প্রচারকের মুখে, তারপর হস্তলিখিত পুঁথিতে পুঁথিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিতে বহুদিন লাগিত। ইতিহাসের গণনানুসারে লক্ষ্মণ সেন ও রামানুজ একই শতাব্দীর লোক। কিন্তু জয়দেব যখন বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষে বেশ দৃঢ় আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বিষ্ণুর কোন না কোন অবতারের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রকাশ্যতঃ তাঁহাদের মন্দিরাদি গঠিত হইতেছে এরূপ ধারণা হয়। কেহ বিষ্ণু পুরাণ দেখিতেছে, কেহ মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের দিকে অধিক মনোযোগ দিয়াছে, কেহ হয়ত কোথাও কৃষ্ণের বাৎসল্য ভাবের চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে আবার কেহ হয়ত তারই পাঁচ শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে রাসপঞ্চাধ্যায়ের আলোচনা করিতেছে, ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এমন একটা তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে ইহাও কল্পনা করা যায়। সুতরাং জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সভাস্থ পণ্ডিত বলিয়া রামানুজ ও জয়দেব একই

সময়ের লোক ইহা বলিতে গেলে চিন্তার ক্রমবিকাশ—বৌদ্ধ ও শৈব ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুষ্টির ক্রমবিকাশ—সুস্পষ্ট হয় না। রামানুজ ও জয়দেবের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে দুই শত বৎসরের ব্যবধান আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এমন কি অনেক পুরাণ রামানুজ স্বামীর পরবর্ত্তী সময়ের রচিত বলিয়া কথিত হয়।

ভারতবর্ষের বৈষ্ণবগণ প্রধাণতঃ চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত *। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ মধ্বাচার্য্য বা ব্রহ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত। কিন্তু মধ্বাচার্য্যও দ্বাদশ শতাব্দীর, সর্ব্বশেষ ভাগের লোক। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে যে মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়াছেন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানের তাহাই সর্ব্ব প্রথম মূর্ত্তি একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। পূর্ণব্রহ্ম রূপে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তিই প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। তাপর বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইয়া বিবিধ শাখায় বিস্তার প্রাপ্ত হইলে ক্রমবিকাশানুসারে যুগলমুর্ত্তি চতুর্ভুজ বিষ্ণুর স্থান অধিকার করিয়াছে। কোন উদ্দেশ্য বিশেষের জন্য জয়দেব, হয় সেই মূর্ত্তি বিদেশ হইতে আনিয়াছেন, না হয় স্বকীয় কল্পনা বলেই উদ্ভাবন করিয়াছেন। বহু প্রাচীনকালের শিলা-খোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন পুরাতন রূপ বঙ্গদেশে আর কোথাও পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই যুগল মূর্ত্তি।

জয়দেব স্বীয় ধর্ম্মের মুলসূত্র পুরাণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট লীলা কোন পুরাণেই নাই এবং রাধা নামও অতি আধুনিক

*। সনকাদি সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায়, শিব সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম সম্প্রদায়।

পদ্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে নাই। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতে এ নাম পাওয়া যায় না।*

সর্ব্ব প্রথমে জয়দেবকে কোন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিবার সবিশেষ কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনে হয় তিনি অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গঠিত ধর্ম্মের ছায়ায় বসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন কিন্তু পার্শ্বস্থ সমাজের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া তাহার সংশোধনের জন্য নিজে একটা পন্থা কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ঐ পন্থা সম্পূর্ণ অভিনব এবং স্বাধীনভাবাপন্ন। জয়দেবের শিক্ষা এবং মনের বল এত অধিক ছিল যে একটা সম্পূর্ণ নূতন মত সমাজের মধ্যে আনয়ন করিতে কোনরূপ ভয় বা দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থার সম্মুখে অসিহস্তে কেহ দণ্ডায়মান হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না কিন্তু অনুমান করা যায় যে ঐ পন্থা এতই মধুর যে ধীরে ধীরে বিষের ক্রিয়ার ন্যায় তাহা সমাজের মধ্যে কার্য্য করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান তাঁহার সময় হইতেই হয় কিন্তু তিনি তাঁহার মতের সারাংশ বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়ন করিয়া তাহা গঠিত করিয়াছিলেন।

জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলি গ্রামে জয়দেবের সমাধি আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি বৃন্দাবনে অবস্থানকালে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন কিন্তু এ বিষয়ের কোন সত্যতা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। শুধু স্মৃতি মাত্র লইয়া সমাধি হয় কি না বলা যায় না। বৈষ্ণবগণ প্রকৃতই দেহ সমাহিত করিয়া থাকেন। যদি ঐ সমাধি স্মৃতিমাত্র না হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে মৃত

*। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচিত গাথা সপ্তশতীতে নাকি রাধা ও কৃষ্ণের নাম একটী শ্লোকে পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার একটী প্রবন্ধে ইহা লিখিয়াছেন।

দেহ পুঁতিয়া ফেলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। নবাগত মুসলমানদিগের দেখিয়া সুপণ্ডিত জয়দেবের হৃদয়ে এইরূপ একটা খেয়াল হইয়াছিল যে আমি মরিলে এই মুসলমানদিগের মত আমকে কবর দিও—একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামী। স্বয়ং এবম্ভূত কোন একটী মত গঠিত করিয়া স্বকীয় সাহসিকতার পরিচয় স্বরূপ যদি জয়দেব এ প্রকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য মধ্যে কতকাংশে নিশ্চয়ই এ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিতে হইবে; কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে দুই তিন শত বৎসরের কোন বিবরণের মধ্যে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মুসলমানদিগের লিখিত সেকালের বিবরণ মধ্যে হিন্দুদিগের এ একটা অদ্ভুত আচারের বিষয় নিশ্চয়ই তাহা হইলে বর্ণিত হইত। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে দৃঢ়ীভূত হওয়ার অনেক দিন পরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতিনীতি যখন পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘাত প্রতিঘাত করিতেছিল, যখন রামানন্দ মধ্যভারতে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে শিষ্যবর্গকে আহ্বান করিয়া এক অপূর্ব্ব উদার সার্ব্বজনীন প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে জয়দেব তথাবিধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহারই প্রতিধ্বনি গাহিতেছিলেন মাত্র। রামানন্দ স্বামীর অসংখ্য শিষ্য ছিল, তাহারা ভারতবর্ষের সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব স্থানে ছড়াইয়া গিয়াছিল। জয়দেব সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামানন্দ রামানুজ স্বামীর বহু পরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি রামানুজের শিষ্য প্রশিষ্য মধ্যে চতুর্থ স্থানীয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই হিসাবে রামানন্দ স্বামীকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জয়দেবকে উক্ত সময়ের বা তাহারও পরবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া এই মতানুসারে স্থির করা যাইতে পারে।

(খ) সমসাময়িক সাহিত্যে।

অলঙ্কার সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় চারিখানি প্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বরস্বতীকণ্ঠাভরণ, দশরূপ, কাব্যপ্রকাশ এবং সাহিত্যদর্পণ। সংস্কৃত ভাষার কাব্যসমুদ্র মন্থন করিয়া এই চারিখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। যে কবির নাম বা রচনার উদাহরণ এই চারিখানি গ্রন্থে নাই, বিশ্বাস করিতে হইবে যে সে কবি এই চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়নের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিম্বা এই সকল গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কাহারই জানিত ছিলেন না।

সাহিত্যদর্পণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ এবং এই অলঙ্কারগ্রন্থের প্রণেতা বঙ্গদেশেরই অধিবাসী। এই গ্রন্থ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (মতান্তরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে *) প্রণীত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ, জয়দেবের জীবনকালের মধ্যেই, ইহার চমৎকারিত্বে ও নূতনত্বে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে কোন সংস্কৃত সাহিত্যিক এ পুস্তক পাঠ করেন নাই বা ইহার কবিত্ব শুনেন নাই এ কথা বলা চলে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সাহিত্য দর্পণের পূর্ব্বে যে তিনখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে গীতগোবিন্দের পরিচয় ত নাইই, সাহিত্য দর্পণেও নাই। "হৃদি বিসলতা" ও "উন্মীলন্মধুগন্ধ" ইত্যাদি দুই একটী শ্লোক সাহিত্যদর্পণের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু এ সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীমৎ আনন্দরাম বড়ুয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল †।

* 'The Sahitya Darpan was composed in Eastern Bengal, about 1450 A.D. by Visyanath Kaviraj, Macdonell.

† I am, therefore, of opinion that the Sahitya Darpan was written soon atter the Kavyaprakasha and its exact age

গীতগোবিন্দকার জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিলে বা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক হইলে সাহিত্যদর্পণকার নিজের দেশের সুবিখ্যাত কবির লেখনী হইতে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লইয়া যে তাহার ব্যবহার করিতেন তাহা সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে গীতগোবিন্দের মধ্যে ছন্দ ও অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয় অলঙ্কার সম্বন্ধের সব পুস্তক কয় খানিই জয়দেবের আয়ত্ত ছিল।

গীতগোবিন্দের মধ্যে নৈষধচরিতের অনেকগুলি ভাব সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। কোন কোন মতে নৈষধচরিত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় *। তাহা হইলে জয়দেবের তৎপরে বর্ত্তমান থাকাই সম্ভব। জয়দেবের ছন্দলালিত্য ও নৈষধচরিতকারের ছন্দলালিত্য এতদুভয়ের তুলনা করিলে জয়দেব যে তদপেক্ষা মার্জ্জিত ও পরবর্ত্তী এ বিষয় উপলব্ধি করিবার কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার অবস্থা ও আকার কিরূপ ছিল তাহা

---

will be determined if it is remembered that it succeeded the Naishadha Charita but did not succeed the Gita Govinda. The first point is clear from its mentioning Naishadha by name (p 208) and the second from its not quoting from the latter. The verse III—11 of the Gita Govinda does indeed occur in the printed Sahitya Darpana (p 289), but it has apparently been inserted by some copyist, as the large paragraph following it does not make any use of this verse, but of the verse preceding it. If it really quoted from the Gita Govinda the name would have been mentioned at least once in the body of the work.

Bhababhuti and his place in Sanskrit Literature.

* The Naishadha Charita was written at Benares in the

বলা যায় না। বঙ্গভাষায় লিখিত সে সময়ের ক্ষুদ্র পুস্তক বা অসংলগ্ন ভাবের ভাষার উদাহরণ হয়ত পাওয়া গিয়াছে* কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার প্রকৃত ভাষার পরিচয়-হৃদয়ঙ্গমহয় না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অনেক সংস্কৃত পুস্তক অবশ্যই রচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব যে ছিল না অথবা সে সময় পালি কিম্বা প্রাকৃতের ন্যায় কোন ভাষা যে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইত তাহা বলা অসঙ্গত—কারণ বঙ্গভাষার অস্তিত্ব না থাকিলে অল্প ব্যবধানের মধ্যে চণ্ডিদাসের লেখায় অমন সুমিষ্ট বাঙ্গালার উদাহরণ পাওয়া যাইত না। বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহৃত হইত এবং বিদেশীয়-আবর্জ্জনা-বিহীন মিষ্ট বাঙ্গলাই ব্যবহৃত হইত। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হউক, কিন্তু সংস্কৃতের অন্তরালে বঙ্গভাষা যেন স্বপ্নের ন্যায় মাথা তুলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় এরই আর দুই দিন পরে এই স্মৃতি চণ্ডিদাসের ভাবের উৎসে শীঘ্রই স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

second half of the twelfth century. So says Rajashekara in his Pravandha Kosh—a work of the 14th century and his statement appears to me to be perfectly correct.

Borooah.

"It was composed by Sriharsha, who belongs to the latter half of the twelfth century.

Macdonell p. 330.

* সাহিত্য পরিষৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক যে পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদের মতে তাহারই ভাষা বোধ হয় বঙ্গের আদি ভাষা। কারণ পরিষৎ বলিতেছেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের কয়টী গীত হুবহু উক্ত কৃষ্ণ কীর্ত্তনের literal translation এবং কৃষ্ণ কীর্ত্তনই আদি গ্রন্থ ; জয়দেব তৎপরবর্ত্তী। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারের নাম চণ্ডিদাস। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ঐ চণ্ডিদাস নাকি আবার ১০।১৫ জন ছিল। এই সকল theoryর মূলে দেশ বিখ্যাত অনেক বড় বড় পণ্ডিত রহিয়াছেন নগণ্য কোন ব্যক্তির কোন কথা সেখানে টেকা অসম্ভব। কৃষ্ণকীর্ত্তন বাঙ্গালার সব জেলা কয়টা ঘুরিয়াই আসুক কিম্বা এক স্থানেই

জয়দেব

সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সকল ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ নিয়ম এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা নূতন জিনিস যখন সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার তরঙ্গ সেই সময়ের অল্পদিন মধ্যে যেরূপ উত্থিত হয়, কিছু দিন অতিবাহিত হইলে কালের নূতনত্বে ও পরিবর্ত্তনে তাহার কিছুই থাকে না। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গীয় যুবকের মনের স্রোত আজ এ প্রকার ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে কেন? ফরাসী বিদ্রোহের সাম্য-নীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সকল কবিতেই পরিস্ফুট, কিন্তু ভিক্টোরিয়া রাজত্বের শেষভাগে তাহার চিহ্নও পাওয়া যায় না। জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিলেন, সুললিত, মধুরবাক্যবিন্যাসে, কবিত্ব ও সঙ্গীতের চমৎকারিত্বে, তাহা কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—সে সঙ্গীতের অনুকরণ, সে সঙ্গীতের তরঙ্গ, কখন উত্থিত হইবে? তরঙ্গ জয়দেবের নিকটবর্ত্তী সময়েই উত্থিত হওয়া উচিত—সেই জন্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের আবির্ভাব—সুর এক, বিষয় এক, কেবল ভাষা স্বতন্ত্র, খুব স্বতন্ত্র নহে সেইরূপই কোমল শব্দ ও কোমল ভাবময়। বোধ হয় সেকালে বাঙ্গালাভাষায় পুস্তক লিখিবার রীতি ছিল না বলিয়াই বাধ্য হইয়া জয়দেবকে সংস্কৃতের সাজ সজ্জা দিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার শব্দ সমষ্টি

রক্ষিত হইয়া থাকুক উহার ভাষা যে উড়িয়া ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণ তাহাতে ভুল নাই। উহার ভাষা এখনও মানভূমের কতকাংশে, মেদিনীপুরের কতকাংশে ও বাঁকুড়ার কতকাংশে ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণ কীর্ত্তনকার এই সকল স্থানের মধ্যের কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন। আমি ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে মানভূমে বৈষ্ণব ভিখারীর মুখে "যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোহ্মারে" গান শুনিয়াছি। শুধু কৃষ্ণ কীর্ত্তন কেন, ঐ শ্রেণীর আরও অনেক পুঁথি ঐ সব দেশে আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বাঙ্গালীর এত প্রিয় জয়দেব ও চণ্ডিদাস প্রত্নতত্ত্বের জয়ডঙ্কায় বিলুপ্ত হইতে চলিল বলিয়াই বোধ হইতেছে।

সহজ বোধগম্য ও প্রচলিত বঙ্গভাষারই অনুরূপ। বঙ্গভাষার অনুরূপ হইলেও সংস্কৃতের আবরণ থাকার জন্য কালক্রমে ভাবের অধিকতর বিকাশের নিমিত্ত বঙ্গভাষারই উন্মেষ হইতে লাগিল। চণ্ডিদাস যেমন ভাবের অদম্য তাড়নায় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বঙ্গভাষাও সেইরূপ নিজের আবশ্যকতায় স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

জয়দেব যদি দ্বাদশ শতাব্দীরই লোক হয়েন, তাহা হইলে চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি এত দীর্ঘকাল পরে সাহিত্যক্ষেত্রে কেন সেই ভাব গাহিতে আরম্ভ করিবেন? জয়দেব যে সঙ্গীত ও যে বিষয়ের সূত্রপাত করিয়া দিয়া গেলেন, আড়াই শত তিন শত বৎসর শিথিল ব্যবধানের পর ভারতবর্ষীয়ের মনে সে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি উঠিল, বিশেষ কারণ না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। জয়দেব এবং বিদ্যাপতিতে ও তৎসাময়িক চণ্ডিদাসে অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের ব্যবধান আছে বলিয়াই বোধ হয়। ১৪৮৫ খৃঃ হইতে ১৫২৭ পুর্য্যন্ত চৈতন্যের জীবন কাল ও ১৪১৭ খৃঃ হইতে ১৪৭৭ পর্য্যন্ত চণ্ডিদাসের জীবনকাল; ইহারই নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে, অর্থাৎ ১৩৫০ খৃঃ হইতে ১৪৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত শত বৎসরের মধ্যে, জয়দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ অনুমান অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

(গ) প্রচলিত মতের প্রমাণের অভাবে।

জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক মনে করিবার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কথাটা কিন্তু বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার একটীমাত্র কারণ এই যে গীতগোবিন্দের মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের সভায় কয়েকজন পণ্ডিতের নামসংযুক্ত একটী শ্লোক আছে

কেবলমাত্র সেই শ্লোকটীই * এই অনুমানের ভিত্তি। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক স্থির করিবার জন্য অন্য যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সমসাময়িক সপ্রমাণ হয় না, কেবলমাত্র এই অনুমানটীকে তদ্দ্বারা দৃঢ় করা যাইতে পারে। যখন ঐ একমাত্র শ্লোকই সকল অনুমানের হেতু তখন সর্ব্ব প্রথম ঐ শ্লোকটীর সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রথম কথা এই যে জয়দেব তাঁহার পুস্তকের মধ্যে কোন স্থানে লক্ষ্মণ সেনের নামোল্লেখ করেন নাই। জয়দেব তাঁহার পিতা মাতা, পত্নী, বাসস্থান, এমন কি, তাঁহার পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুর নামোল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু যিনি পরমবন্ধু, যাঁহার অন্নে তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বা পরোক্ষভাবে কোন উল্লেখ তাঁহার পুস্তকে নাই। পক্ষান্তরে আবার ঐ শ্লোকে উল্লিখিত ধোয়ী কবি, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সকলেই আপন আপন পুস্তক মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

শ্লোকটী গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবেশিত। বর্ত্তমানকালে পব্‌লিশর যেমন বিজ্ঞাপন দেয় সেইরূপ বিজ্ঞাপন বা ভূমিকাস্বরূপ উহা লিখিত। পরের দোষ প্রকাশের জন্য দাম্ভিকতা সূচক একটা শ্লোক লেখা এবং তাহাই নিজের লেখার মধ্যে সন্নিবেশিত করা একজন হৃদয়বান কবির পক্ষে অসম্ভব কিন্তু একজন পব্‌লিশর অনায়াসে উহা লিখিতে ও প্রকাশ করিতে পারে। সেকালে হাতের লেখায় লেখায় পুস্তক প্রচলিত হইত, সুতরাং জয়দেবের গুণগ্রাহী কোন লেখক উহা না লিখিয়াছেন তাহাই বা কে বলিল?

সমস্ত প্রসিদ্ধ টীকাকারই ঐ শ্লোকটীর উপর সন্দিহান হইয়া উহার ব্যাখ্যা-বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন। রাণা কুম্ভ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন কবিগণনাচ্ছলে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ—ইত্যাদি, ১—৪।

উমাপতি, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী ও শরণ এই চারিজন কবি জয়দেব অপেক্ষা অনেক নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য। সুতরাং একজন প্রকৃত কবির তদপেক্ষা নিম্নপদস্থ লেখকগণের সমালোচনা করিবার কোন কারণ নাই। লক্ষ্মণ সেনের সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া যদি জয়দেবের কোন কারণে ঈর্ষা হইয়া থাকে তাহা হইলে লেখা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে জয়দেবও তাহার প্রতিদান অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঐ চরিজনের লেখার মধ্যে জয়দেবের কোন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

জয়দেবের লেখার মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের নামোল্লেখ ত নাইই, তাঁহার জীবনী .সম্বন্ধে, কি উড়িষ্যা, ও কি বঙ্গদেশ, ইহার মধ্যে যত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারও কোনটীর মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনের কিছুমাত্রও উল্লেখ নাই। বনমালী দাস জয়দেবের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন সেখানি প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরাতন। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে বর্দ্ধমানের কোন রাজা জয়দেবের বিবাহ ও বিগ্রহ স্থাপনার বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান রাজবংশের বোধ হয় সে সময় অস্তিত্ব ছিল না, ইঁহারা তাহার পরবর্ত্তী সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বনমালী দাসের অবশ্য ভুল হইতে পারে কিন্তু ঐ রাজাই বাস্তবিকই যে লক্ষ্মণ সেন কি না তাহা বিশ্বাস করিবার অদ্যাবধি কোন কারণ পাওয়া যায় নাই।

সেন বংশের তাম্রলিপি পড়িয়া জানা গিয়াছে যে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া জয়দেব তাঁহার সভায় বিদ্যমান থাকিবেন, এ কারণ অগ্রাহ্য করিবারই যোগ্য। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের সেখ শুভোদয়া নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে লক্ষ্মণ সেন জয়দেব ও পদ্মাবতীর কৃষ্ণ ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন—ইহাও জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক বলিয়া দৃঢ়রূপে

বিশ্বাস স্থাপনের পরবর্ত্তী। বুলার সাহেব কাশ্মীরে একখানি জয়দেবের পুঁথি পাইয়াছেন তাহাতে লক্ষ্মণ সেন জয়দেবকে কবিরাজ উপাধি দিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইহাও বিশ্বাস স্থাপনের যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন টীকাকার কুম্ভের পুস্তকে এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণ সেনের নামোল্লেখ হইয়াছে, কারণ উমাপতি প্রভৃতি লেখকগণ লক্ষ্মণ সেনের সভাতেই বর্ত্তমান ছিলেন সে বিষয়ে কোন কালেই সন্দেহের কারণ পাওয়া যায় নাই।

কোন পুস্তক বা তাম্রলিপিতে লক্ষ্মণসেনের সময়ে লিখিত "গীতগোবিন্দকার" জয়দেব বলিয়া উল্লিখিত এমন কোন লেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয় মীমাংসিত হইবার উপায় নাই, অন্যথা সমস্তই অনুমান মাত্র।

কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব নামক কোন পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন না কি? ছিলেন বলিয়া অনুমানই এখানে করিতে হইবে; এবং তাহাই সমস্ত গণ্ডগোলের হেতু। রাণাকুম্ভ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য কি শেষ ভাগে প্রণীত তাঁহার টীকার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তারপর চৈতন্যদেবের সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তীকালে যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়া বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং যা কিছু বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে পাওয়া যায় সকল বিষয়েরই ইতিহাস, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা জিনিসের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন বৈষ্ণবগণ সেই জয়দেবকে এই জয়দেবের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিলেন। সনাতন গোস্বামী লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারদেশে তাঁহার সভার পাঁচটী পণ্ডিতের নাম প্রস্তর ফলকে খোদিত দেখিয়াছিলেন, * ঐ পাঁচজন পণ্ডিত গীতগোবিন্দেই উল্লিখিত পাঁচটী

---

* উক্ত সভাদ্বারে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত ছিল—
গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

ব্যক্তি। এই মিল অনুসারে উক্ত অনুমানের উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকে নাই। কারণ লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব নামক যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি গোবর্দ্ধনাদি অপেক্ষা অল্প প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার নাম সনাতন গোস্বামীর সময় বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

কিন্তু একটা সন্দেহ এই স্থানে প্রবল হইয়া উঠে যে, বাস্তবিক যদি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী সময়ের লোকই হয়েন তবে, তিনি স্বয়ং ঐ শ্লোকটী লিখিয়া থাকিলে, এত কবি থাকিতে লক্ষ্মণসেনেরই সভাস্থ কবিদিগের নামের সহিত আপনাকে সংযোগ করিয়া দিলেন কেন? আর যদি কোন গায়ক বা কথক কিম্বা কোন গুণগ্রাহী পুস্তক নকলকারীই ঐ শ্লোক সংযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন কিম্বা কোন কবিগণনাকারীই উহা রচনা করিয়া থাকেন, তবে শ্রীহর্ষাদি এত ভাল ভাল কবি থাকিতে ধোয়ী, শরণ আদি এতগুলি অপ্রসিদ্ধ ও অশ্রুতপূর্ব্ব নামের সহিত জয়দেব কেন মিশ্রিত হইলেন?

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, আমাদের নিকট ঐ নামগুলি অশ্রুতপূর্ব্ব, কিন্তু সংস্কৃতই যখন বঙ্গদেশের একমাত্র শিক্ষা ও গৌরবের জিনিস ছিল, তখন বোধ হয় ঐ সকল লেখকের নাম অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল না। ঐ সকল লেখক বোধ হয় জয়দেবের পরবর্ত্তী অনেক কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বোধ হয় সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আর্য্যাসপ্তশতী, পবনদূত প্রভৃতি গ্রন্থ খুবই পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিল। এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে ঐ সকল লেখক বঙ্গদেশীয় বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবিগণনায় জয়দেবের সঙ্গে স্থান পাইয়াছেন।

যদি ইতিহাস মানিতে হয় তাহা হইলে উড়িষ্যার ইতিহাসে জয়দেব সম্বন্ধে আর একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। অনঙ্গভীমদেব

১১৯৭ * খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকের মনে ইতিহাসের আলোচনায় স্বতঃই এ বিশ্বাস হইবে যে অনঙ্গ-ভীমের বংশধরগণ যখন আপনাদিগকে জগন্নাথের "ঝাড়ুদার" বলিয়া ঘোষণা করিয়া যাইতেছিলেন সেই সময় হইতেই জগন্নাথক্ষেত্র তীর্থরূপে ঘোষিত হয়। তাহার পূর্ব্বে জগন্নাথ "তীর্থে"র ঘোষণা ভারতবর্ষে কতটা ছিল সন্দেহ স্থল। বহুকাল পূর্ব্বে ৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যযাতী কেশরী হিন্দু ও বৌদ্ধকে এক করিবার জন্য বৌদ্ধমন্দিরে বৌদ্ধের ঠাকুরে (বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ) হিন্দুত্বের আরোপ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা ঘোর শৈব, সেই বংশধরগণের সময় জগন্নাথের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছিল, অনঙ্গ-ভীম তাহার আবিষ্কর্ত্তা। জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীতে পাওয়া যায় যে তিনি জগন্নাথের মন্দিরে গীতগোবিন্দ গান করিতেন। যাঁহারা এমত গ্রাহ্য করিবেন, ইতিহাস মানিতে হইলে জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক মনে করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইবে না। অন্ততঃপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়দেবের আবির্ভাব বলিয়াও তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে।

যে সকল পুস্তকে জয়দেবের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার মধ্যে সাহিত্যদর্পণের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আর একখানি বহুদূরবর্ত্তী বিদেশীয় গ্রন্থে জয়দেবের নাম এবং গীতগোবিন্দকার জয়-দেবেরই উল্লেখ আছে। জয়দেবকে দ্বাদশ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক স্থিরীকরণের সম্বন্ধে যতগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদ বর্দ্দাই এর পৃথ্বীরাজ রাইসা নামক পুস্তকে ফুট-

---

* কোন কোন মতে ১১৭৪।

নোটে লিখিত পদটী * দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রসঙ্গে এই পদটী পাওয়া গেলে অবশ্যই কোন সন্দেহের কারণ থাকিত না কিন্তু কবিগণনার প্রসঙ্গে এই পদটী লিখিত হওয়াতেই অনেকের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে পরবর্ত্তী সময়ে ঐ গ্রন্থ যাহারা নকল করিয়াছিল জয়দেবের ন্যায় এত বড় লেখকের নাম তাহাতে না পাইয়া অবলীলাক্রমে ঐ পদটী বসাইয়া দিয়াছে, তাহার কারণ জয়দেব বঙ্গদেশের ন্যায় রাজপুতানাতেও অতি প্রসিদ্ধ। পৃথ্বীরাজ রাইসা হিন্দী সাহিত্যের প্রথম কাব্য, ইহা গায়কদের কণ্ঠে কণ্ঠেই ফিরিত এবং রাজপুতানায় বহু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চাঁদ কবির হস্ত লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া গেলে এ বিষয়ের সকল গণ্ডগোলই মিটিয়া যাইতে পারে। †

এইরূপ ভাবে কয়েকটী বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ পরবশ হইবার কোনই কারণ থাকিত না যদি একটী কোনও অকাট্য কারণ এ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। শুধু জয়দেবই নহেন হিন্দুস্থানের এমন কত বড়

* জয়দেব অঠ্ঠং কবী কব্বিরায়ং।
জিনে কেবলং কিত্তি গোবিন্দ গায়ং॥

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে হত হয়েন। চাঁদকবিও ঐ সময়ে নিহত হইয়াছিলেন।

† The most celebrated of such epics is the *Chand Raisa* composed by Prithviraj's court poet Chand Bardai. The poem, written in archaic Hindi, has been constantly enlarged by reciters, as no doubt the Homeric poems were, and is believed to comprise about 125,000 verses. But the original composition of only 5000 verses, is said to be still in existence and in the costody of the poet's descendant, who resides in the Jodhpur state. The Oxford History of India P. 196

Vincent A. Smith.

বড় জিনিস সময়ভ্রষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নও বোধ হয় এইরূপে সময় ও স্থান ভ্রষ্ট হইয়া একসঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছেন। এবং বিক্রমাদিত্য স্বয়ংই যে কোথাকার বিক্রমাদিত্য কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। হিন্দুর সাহিত্য ও ইতিহাসের সময় নির্দ্ধারণে কত বড় বড় পণ্ডিতের মত উড়িয়া যাইতেছে এবং তাঁহাদের বিশাল চিন্তা ও পরিশ্রম যে ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে তাহা নিত্যই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ম্যাক্সমূলর বা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় পণ্ডিতেরও কত বড় বড় গবেষণা আজকাল উড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞানের আলোক যত প্রসারিত হইতেছে ততই নূতন নূতন সত্য মনুষ্যের গোচরে আসিতেছে। জয়দেব সম্বন্ধেও যে সকল কথা অজানিত আছে হয়ত কালক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং আমাদিগের ভ্রম থাকিলেও তাহা তিরোহিত হইবে এবং অপরপক্ষের প্রকৃত সত্যতাও নিরূপিত হইতে পারিবে। অজয় নদের উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশের হস্ত লিখিত পুঁথি, উড়িষ্যার প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি এবং বৃন্দাবনের প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় জয়দেব সম্বন্ধে অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সমসাময়িক ধর্ম্ম ও বঙ্গীয় সমাজ।

আমরা যদি জয়দেবকে দ্বাদশ শতাব্দীরও লোক বলি, তাহা হইলেও আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এখন জয়দেবের সময় বঙ্গদেশে ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা না দেখিলে, গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না এবং তাহার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা থাকিতে পারে কি না তাহাও বিশদ হইবে না।

যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব, তখন বঙ্গদেশ যে হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াছিল তাহা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ মগধ রাজ্যের এত সন্নিকটে থাকার জন্য বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে খুব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল ধর্ম্মপূজা প্রভৃতি কতকগুলি পূজা পদ্ধতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্মপূজার কেন্দ্রস্থল, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলা। বঙ্গের সমস্ত পশ্চিমাংশ—মেদিনীপুর, মানভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম এককালে জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ছিল। এই সকল প্রদেশে এখনও বড় বড় জৈনকীর্ত্তি বর্ত্তমান এবং বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধস্মৃতি বহু স্থানেই দেখা যায়। মানভূম জেলার ত প্রতি পল্লীতে এবং বনে বনে ও মাঠে মাঠে, বড় বড় প্রস্তর মন্দির ও তাহার ধ্বংস চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় এবং উলঙ্গ তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি ত পথে পথে কাশীর শিবলিঙ্গের ন্যায় ছড়ান বলিলেই হয়। এই সমস্ত পশ্চিম ভূভাগে সরাক নামক এখনও একটী প্রাণী-হিংসা-বর্জ্জিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। সরাক শ্রাবক শব্দের অপভ্রংশ। এই সকল দেশে এখনও সরাকদিগের সংখ্যা প্রায় ষোল সতর হাজার।

হুয়েন্থসঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গদেশে শশাঙ্ক নামক একজন প্রতাপশালী রাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকল্পে যত্নবান হওয়ায় রাজচক্রবর্ত্তী কণোজের অধীশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কতগুলি দেশকে হিন্দুত্বের প্রতি আস্থাবান করিতে পারিয়াছিলেন বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশীয় নৃপতিগণ প্রবল হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বঙ্গদেশের মধ্যে আবার বিস্তৃত হইল। ইহার পরে

আদিশূরের হিন্দুত্বের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টার কথা সকলেই বিদিত আছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে বহু প্রাচীন সময় হইতেই, বোধ হয় হুয়েন্থ সঙ্ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই, বঙ্গদেশে তুমুল বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছিল। তারপর ভারতবর্ষে শৈবধর্ম্মের প্রচার হইল। শৈবধর্ম্মের তরঙ্গ দাক্ষিণাত্য হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যখন দশম শতাব্দীর শেষভাগ ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, তখন সেন রাজাদিগের উজ্জ্বল পরাক্রমজ্যোতি বঙ্গদেশের চতুঃসীমা পার হইয়া প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বিধর্ম্মী রাজাদিগের নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সেন রাজাদিগের পরাক্রম লোপ করিয়া পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজাইবার জন্য চট্টগ্রাম হইতে পাটলিপুত্র এবং কামরূপ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত ভূভাগের মধ্যে আর কোন রাজাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে না। হিন্দু পারিষদ্, হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু কবি ও হিন্দু দার্শনিকে রাজসভা পরিপূর্ণ। একদিকে দেশ জয় করিয়া বঙ্গরাজ্য বর্দ্ধিতায়তন করিবার জন্য যেমন তাঁহাদের বিপুল আয়োজন, অপর দিকে রাজ্যের আভ্যন্তরীন উন্নতিকল্পেও তাঁহাদের সেইরূপ লক্ষ্য। তাই তাঁহাদের সময়ে বঙ্গদেশে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শৈবধর্ম্ম দেশ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল। পাহাড়, জঙ্গল প্রভৃতি অতি নিভৃত প্রদেশ হইতেও বৌদ্ধকে তাড়াইয়া শৈব তাহার স্থান অধিকার করিল। এখন যেখানে বৈদ্যনাথ তীর্থ (দেওঘর) এক সময়ে তাহা বৌদ্ধদিগেরই আশ্রয় ছিল। লক্ষ্মণ সেন এবম্ভূত বিক্রমশালী সেন বংশের কলঙ্কস্বরূপ।

সেন রাজাদিগের সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও শৈবধর্ম্মই বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছিল। শুনা যায় লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন

কিন্তু কি ভাবে তিনি প্রবল শৈবযুগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিলেন বলা যায় না।

কোন একটা মত বা ধর্ম্ম যখন সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন তাহার মধ্যে কোনরূপ জটিলতা থাকে না। কাল যত অগ্রসর হয়, মানুষের সেই বিষয়ের চিন্তা তত প্রসারিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং জটিলতা, মতদ্বৈধ প্রভৃতি নানা ব্যাপার আসিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। সকল ধর্ম্মই নানা শাখা ও নানা মতে বিভক্ত হইয়া পড়িবার একমাত্র কারণ তত্তৎ বিষয়ের চিন্তার প্রসার। তাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা পুরুষ যখন ধর্ম্মজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি তখন দেখিতে পাইল প্রকৃতি ভিন্ন সৃষ্টি হয় না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেবীমূর্ত্তিও আসিয়া উপস্থিত হইল। শিব ও ভগবতী উভয়ে মিলিয়া তখন ধর্ম্মের জগত শাসন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই একই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান সমান ভাগ কোথাও পাইয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু কেহ শিবকে বড় করিল এবং কেহ শক্তিকে বড় করিল, এই ভাবে শৈব সম্প্রদায়ের পার্শ্বে শাক্তসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। যে চিন্তার প্রসার দেবীর উপাসনা শৈবযুগের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল, সেই চিন্তার প্রসার শৈব ও শাক্ত দুইটী পৃথক শ্রেণী বঙ্গদেশের মধ্যে গঠিত করিয়া দিল।

নবদ্বীপ বাঙ্গালার রাজধানী। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই চর্চ্চা সেখানে হইত বলিয়া কূটমস্তিষ্ক ও সরলমস্তিষ্ক বহু পণ্ডিত ও ছাত্র সেখানে হিন্দু রাজার অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের মধ্যে লড়াই নাই, বিদ্রোহ নাই, দুর্ভিক্ষ ও অন্নচিন্তার হাহাকার নাই; পরন্তু তাহার উপর রাজকোষ হইতে পারিতোষিক ও ভূমি দানের সুব্যবস্থা আছে, সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়গণ মনের সুখে বসিয়া বসিয়া

সে সময়ে যে একটা নূতন নূতন মতের অবতারণা করিবেন এবং হয়ত সভা করিয়া প্রতিপক্ষকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নিজের মত প্রবল করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া সৃষ্টিপ্রকরণ কীর্ত্তিত হইতে হইতে পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির দিকেই লোকের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হইল এবং এক প্রকৃতি, শক্তি বা কালী ভিন্ন বাঙ্গালী খাঁটী শৈবধর্ম্ম বা অন্য ধর্ম্ম একরকম ভুলিয়া গেল। নবদ্বীপের কূট-মস্তিষ্ক ভট্টাচার্য্য তখন এক কালী বা দুর্গা ব্যতীত অন্য কিছুই বুঝিতে বা বুঝাইতে চাহে না। শক্তিপূজা Eg. pti n কিম্বা . ssyri nদিগের নিকট হইতেই আসুক, কিম্বা অনার্য্য বা আর্য্যদিগেরই আবিষ্কৃত ধর্ম্ম হউক, বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্যই যে সর্ব্বপ্রথম তাহাকে টানিয়া হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের সময় বাহিরে আনিয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই। পরমা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই প্রকৃতিকে উন্মুক্তবসনে খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালীই প্রথমে বাঙ্গালীর সম্মুখে আনিয়া ফেলিল। বিবসনা কালীমূর্ত্তি বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্যেরই মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কৃত বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই বিবসনা কালী পূজার প্রথা দেখা যায় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যতদূর যাও, যদি কোথাও এবম্ভূত কালীমূর্ত্তি দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যাইবে বাঙ্গালী তাহার মূলে আছে। প্রতি পল্লীগ্রামে ও প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে যেমন বাঙ্গালা দেশে কালীমূর্ত্তির পূজা বা দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা দেখা যায়, অন্য কোন দেশে একটা বিস্তৃত জেলা খুঁজিয়াও তাহার একাংশ পাওয়া যায় না। সে সকল দেশে সাধারণ ভাবে দেবীর পূজা হয়, কিন্তু চৌষট্টি যোগিনী সহ কালী মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি বা দুর্গার মূর্ত্তির পূজা নাই এবং বিবসনা কালীও কচিৎ কোথাও আছে।

বিবসনা শ্যামা মূর্ত্তি শক্তি পূজার মধ্যে স্থান পাইলে অনেক বড় বড় পণ্ডিত সেদিকে মনঃসংযোগ করিলেন এবং সেখানে চিন্তার যে এক বিস্তৃত ক্ষেত্র পাওয়া গেল সেদিক হইতে বাঙ্গালী আর বহুকাল অন্য কোন দিকে চিন্তা সন্নিবিষ্ট করিতে পারিল না। এই নবাবিষ্কৃত (বা প্রাচীন পুস্তক মন্থিত) ধর্ম্মের মধ্যে সারভাগ কতটুকু না বুঝিয়াই পণ্ডিতগণ তাহারই উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বঙ্গদেশীয় তন্ত্রগ্রন্থ সমূহ প্রণীত হইতে আরম্ভ হইল। তন্ত্রগ্রন্থ সমূহকে বহু প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, হউক কিন্তু বহু তন্ত্রগ্রন্থ যে এই যুগে প্রণীত হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

যে পথটায় আমোদ আছে, যাহার সঙ্গে কিছু প্রলোভন আছে, যে পন্থার অনুশীলনে আমার শরীরের সাধারণ বৃত্তি সমূহের কিছু আরাম বা তৃপ্তি আছে, মানুষ সকল ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেই পথের দিকে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয়। তাই তন্ত্রগ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইবার কিছু দিনের মধ্যেই প্রলোভন পরিশূন্য শৈবপন্থা কিম্বা বৌদ্ধের সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিহার করিয়া বাঙ্গালী নবাবিষ্কৃত পন্থায় গা ঢালিয়া দিল।

সর্ব্বপ্রথমে যে সকল তন্ত্রগ্রন্থ প্রচারিত হয়, সকল প্রলোভন মনুষ্যের সম্মুখে ধারণ করিয়া সেইগুলিই সকলকে সে পথে আহ্বান করে নাই, কিম্বা সর্ব্বপ্রথমেই সে সকল গ্রন্থ বামাচার ও দক্ষিণাচার মার্গে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা অনেক, সব পৃথক পৃথক সময়ের রচিত। তান্ত্রিকগণ বলেন তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা এক লক্ষ বা ততোধিক। শুধু তাই নয়, আজিও কৈলাসশিখরে বসিয়া শিব ও পার্ব্বতী যে সকল তন্ত্রতত্ত্ব কহিতেছেন, গণপতি তাহাই লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেছেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, সে সময় তন্ত্রের প্রভাব এত অধিক হইয়াছিল, যে দিন দিন, নূতন নূতন, তন্ত্রগ্রন্থ প্রচারিত

হইতে লাগিল, কাজেই কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা কত ; এইজন্য এক কথায় বলিয়া দিয়াছে গ্রন্থের সংখ্যা নাই এবং নিত্যই তন্ত্রগ্রন্থ বাহির হইতেছে।

তন্ত্রসমূহ অসার বলিবার বা তাহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কোন প্রকার মত প্রকাশ করিবার সাধ্য বা তদ্রূপ জ্ঞান আমাদিগের নাই কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে চাই এবং ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না, যে কালক্রমে সেই ধর্ম্মের অবস্থা এমন শোচনীয় ও ঘৃণিত আকার ধারণ করিল, যাহা মনে করিতে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কুকর্ম্ম, কদাচার ও কুনীতি এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক পাত্রে ভোজন করে, পৃথক পৃথক গৃহের স্ত্রী পুরুষ একাসনে উপবেশন করিয়া আহার করে, কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, সব একত্রে বসিয়া মদ্যপান করে। এ শুধু বঙ্গদেশের নবদ্বীপ নামক সমুজ্জ্বল ক্ষেত্রে নহে। বঙ্গ দেশের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কালীপূজার জয়নিনাদে সর্ব্বধর্ম্ম দেশ হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। অবশ্য একদিনে এতটা হয় নাই। আস্তে আস্তে ও ধীরে ধীরে একটা মত দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, কিন্তু যেখানে প্রলোভন অধিক তাহার পরিণতি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই হইয়া থাকে।

কোন্ সময়ে এই তন্ত্রগ্রন্থ সমূহ বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস এ প্রবন্ধে ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সাধারণ ভাবে ইহাই বলা যাইতে পারে যে খ্রীঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে পূর্ণ প্রভাবে বর্ত্তমান ছিল, তারপর শৈব মত প্রকটিত হইল, তারপর শক্তিপূজা আসিয়া শৈব ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দিল এবং তারই কিছুদিন পরে তন্ত্রোক্ত বিধিসমূহ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। তারপর উক্ত বিধি-

সমূহ ভদ্রমূর্ত্তি পরিহার করিয়া বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিতে আরও অনেক সময় লাগিয়াছে। জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্ত্রবিধি সমূহের আকার তখন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার পুষ্টির কোন অংশই বাকী নাই। বীরাচার, পশ্বাচার, ভৈরবীচক্র, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি যা কিছু দুর্ব্বোধ্য, অথবা সাধারণ-বোধ-বহির্ভূত জিনিস তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে আছে, সমস্তই তখন সম্পূর্ণপ্রায়। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব দেশের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছে, মানুষ শরীরের ঘৃণিত বৃত্তি সমূহ চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত। সৌন্দর্য্য বা কাব্যচর্চ্চায় লোকের মন নাই, নিকৃষ্ট জড়ত্বের অনুশীলনে সকলে রত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে পার্থক্য এই যে ভারতবর্ষের লোক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া চিরকাল মুক্তি নামক একটা জিনিসের জন্য ব্যস্ত। পুনর্জন্ম নামে এই কথাটা ভারতবর্ষের লোকের অস্থিমজ্জার মধ্যে এমনি অনুপ্রবিষ্ট যে তার কোন অস্তিত্ব আছে কি না ইহার কোনরূপ বিচার না করিয়াই বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই ঐ এক বিষয়ের জন্য ব্যস্ত। ঐ একটা মাত্র খুঁটার উপর ভারতবর্ষের এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্মমত নির্ভর করিতেছে। সামান্য আঘাতে ঐ একটা জিনিস ভাঙ্গিয়া দিলেই ধর্ম্মও চূর্ণ হইয়া যায়। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই যখন মুক্তি অন্বেষণ করে, তখন শাক্তও যে তজ্জন্য ব্যাকুল হইবে তাহা স্বতঃ সিদ্ধ।

হিঁন্দুর প্রাচীন ধর্ম্ম সে মুক্তির রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা অত্যধিক দুর্গম, বৌদ্ধও মুক্তির পথ বলিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে পথও লোক অনেক কাল দেখিয়া দেখিয়া পরিত্যাগ করিল, সেও বড় কঠিন; অবশেষে শাক্ত সকলকে আহ্বান করিল আমার প্রচারিত মুক্তির পথপানে একবার চাহিয়া দেখ। কি সুন্দর সুখপ্রদ পথ! মদ্যের বোতল মুখে দিয়া জয়

কালী বলিয়া চিত্তকে মুক্তির পথে দৌড়াইয়া দাও! অথবা উলাঙ্গিনী সুন্দরী যুবতীর বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া এক লক্ষ বার বীজমন্ত্র জপ করিয়া লও! তন্ত্র এইরূপ মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল।

শুধু তাই নয়; তন্ত্র বলিল, কলিযুগের ধর্ম্মই ইহাই। কলিযুগে অন্য শাস্ত্রোক্ত পথে যে মনুষ্য সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করে, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জাহ্নবীতীরে কূপ খনন করা যেরূপ, সেই দুর্ম্মতির কার্য্যও তদ্রূপ *। সুতরাং এমন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম আশ্রয় করা কি সহজ কথা! তন্ত্র আরও বলিয়া দিল কলিযুগে অন্য ধর্ম্ম নাই, এত বটেই, তাছাড়া তন্ত্রের প্রদর্শিত ধর্ম্মে একদিনে বা এক মুহূর্ত্তে মুক্তি আনিয়া দেয়! অন্য ধর্ম্মে চিরজীবন হয় ত সাধনা করিতে হইবে তবু সিদ্ধি হইবে না, কিন্তু এপথে এক মুহূর্ত্তে মানুষ সিদ্ধ হয়। অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী যে দেশের লোক, সে দেশের লোকের কাছে এ প্রকার কথার প্রভাব কি সামান্য?

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের নানাবিধ সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হইতে পারে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রারম্ভ নির্ম্মল ধর্ম্মভাবময়, হইতে পারে তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সকলে বোঝে না বলিয়া নানা কথা বলিয়া থাকে, হইতে পারে তাহার মধ্যে চিন্তার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু এবম্ভূত তন্ত্রশাস্ত্র সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মের কতটুকু অংশ আনয়ন করিল? ধর্ম্মের কথা সব উড়িয়া গিয়া লোকে পাইল মুক্তির উপায় দুইটী—মদ্য এবং স্ত্রীলোক, ও পঞ্চমকারের মহোৎসব। বৌদ্ধযুগের পর বঙ্গদেশে এমনিভাবে হিন্দুত্বের মহিমা বিস্তৃত হইতে লাগিল।

প্রত্যেক কার্য্যের একটী করিয়া মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। সেই মুখ্য

---

* কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতোজাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥

উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কতকগুলি কার্য্যপরম্পরা প্রয়োজন হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য যখন বিলম্বসাপেক্ষ ও দূরবর্ত্তী তখন সেই মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মানুষ সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার কার্য্য বা উপায় গুলিকেই উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়া লয়। ঠিক এই নিয়মানুযায়ী মদ্য এবং স্ত্রীলোক এই সময় মানুষের ধর্ম্মপথের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু কি ভাবে হইল? স্ত্রীলোক জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে, স্ত্রীলোকের আসঙ্গে সে সুখ যদি মানুষ তাহা পবিত্রভাবে গ্রহণ করিতে পারে। জড় ও চেতনের সংশ্রবে এমনি একটা আশ্চর্য্য বিধি দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটার বৃদ্ধি হইলেই অপরটীর হ্রাস হইবে, এবং একটী কমিলে অপরটী নিশ্চয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; এবং এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে কিছুদিন মধ্যে অপরটীর চিহ্ন মাত্রও অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ভালবাসা বা প্রণয় চেতনের অনুশীলন, মনের সঙ্গে মনের বাঁধা বাঁধি; সে অনুশীলনে শারীরিক বৃত্তি লুক্কায়িত হইয়া যায়। কিন্তু এ পথে শারীরিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইয়া যায় মন বা চেতন ভয়ে পলায়ন করে। যে লোক ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়াছে আজ এ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তাহারই মন ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে সে আর তাহাকে উঠাইতে সক্ষম হয় নাই। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রভাবে মনের সুকুমার বৃত্তি পলায়ন করিল, স্ত্রীলোকও মদ্য লইয়া মানুষ পশু হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সকল বৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ না করিয়া তারই অধিকতর উন্নতির আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে যখন স্থান পাইল, তখন সেই পশুত্ব পশুত্বের নিম্নতম সোপানে গিয়া উপস্থিত; এই সভ্যজগতে সে সমস্ত গূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ মাত্র করিয়া দিতেও লেখনী কাঁপিয়া উঠে। এইরূপ ধর্ম্মের চর্চ্চায় বাঙ্গালা দেশের পনর আনা সাধারণ লোক সে সময়ে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চতত্ত্বের বর্ত্তমান কালেও অনেকে সুব্যাখ্যা করিয়া ইহা যে কুধর্ম্ম হইতে পারে না এবং মৎস্য মাংস আদির অর্থ ই যে মৎস্য বা মাংস নহে, কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মৎস্য মাংসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যসমূহের সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক অর্থ কে বুঝিয়াছিল? চক্ষু কর্ণের বিষয়ীভূত সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গুপ্ত অর্থ কেহ কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। এই সভ্যযুগে তান্ত্রিকধর্ম্মের বাড়াবাড়ি নাই কিন্তু তাও কালীপূজার রাত্রি, অষ্টমী, নবমীপূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজার দিন কলিকাতার এক একটা মদের দোকানে হাজার হাজার টাকার মদ বিক্রয় হয় বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এত কালী বাড়ী ইহা কোন্ যুগের সংস্থাপিত?

শুধু ইহাই নহে। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের আর একটা অংশ আছে—পশুবধ ও নরবলি*। বাঙ্গলা দেশের সকল লোকই বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, অমুক গ্রামে অমুক কালীবাড়ীতে হাজার বলি বা লক্ষ বলি হইত। ইহা ঠিক গল্প নহে এবং সেকালের অবস্থা বুঝিতে গেলে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবারও কোন কারণ নাই। আজিও দুর্গোৎসব বা কালী-পূজায় (পাঁঠা এত আক্রা তবুও!) অনেক স্থানেই একশত দেড়শত ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। কালীঘাটে অষ্টমী পূজাও অনেকে দেখিয়া থাকিবেন এবং পর্ব্ববিশেষে দেবীমন্দিরে মানত শোধও অনেকের মনে পড়িতে পারে।

বৌদ্ধজগতে ছিল, অহিংসা পরম ধর্ম্ম; আর যাই হিন্দুত্বের পুনরুত্থান হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হইল জীবহিংসাই পরম ধর্ম্ম। ফল, মূল, পুষ্প, নৈবেদ্য, কালীর কাছে মানসিক না করিয়া লোকে ঘরে ঘরে

---

* পশুবধ ও নরবলির পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে। কাম, ক্রোধাদি বৃত্তিকে বধ করাই পশুবধ এবং আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে সমর্পণই নরবলি!

মানত করিতে লাগিল ঘোড়া পাঁঠা। জীবহিংসা, একটা আধটা জীব নহে, একলক্ষ বা দুই লক্ষ জীব এক সঙ্গে বধ করিয়া ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যের ন্যায় একস্থানে ফেলিয়া রাখা! কি বীভৎস ব্যাপার! কেহ কখনও মনের চক্ষে এ অনুমান করিয়াছি কি? তারপর নরবলি। ছাগ কিম্বা মহিষের ন্যায় মানুষ বলি দিতে গেলে রাজার নজরে পড়িতে হইবে, কারণ রাজা সম্ভবতঃ তখন মুসলমান। কিন্তু শাক্তধর্ম্মের সহায়তা-কারী কোন কোন হিন্দু জমিদার প্রকাশ্যতঃও নরবলি দিয়াছেন তাহাও শুনা গিয়াছে। মুসলমান রাজা নরবলির কথা শুনিলেই ধরিয়া লইয়া যাইবে এজন্য প্রকাশ্যে পাঁঠার ন্যায় নরবলির ব্যবস্থা ছিল না, গোপন ভাবে কোন গোপনীয় প্রদেশে অথবা রাত্রিকালে হইত। যখন সর্ব্বত্র মুসলমান শাসন ব্যাপ্ত হয় নাই, পল্লীতে পল্লীতে মুসলমান বাস করে নাই, তখন গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে নরবলি হওয়াও অসম্ভব নহে, কারণ কোন হিন্দুই কালীর ন্যায় "জাগ্রত" দেবতার কোপে পড়িবার ভয়ে সে কথা প্রকাশ করিয়া দিবার সাহস করিত না। এই সুশাসিত ইংরাজ রাজত্বের মধ্যেই (১৮৬৬ খ্রীঃ) কালীমূর্ত্তির সম্মুখে মানুষের কাটা মাথা পাওয়া গিয়াছে, সেকালের কথা ত দূরের কথা। দুর্ভিক্ষ, মারীভয় প্রভৃতির প্রকোপ যখন অধিক হইত, তখন কালীর কোপ শান্ত করিবার জন্য নরবলির ব্যবস্থা হইত শুনা গিয়াছে*। মানুষ নিরপরাধী মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যা করিতেছে, এতদপেক্ষা সমাজ কিম্বা ধর্ম্মের ঘৃণিত অবস্থা আর কি হইতে পারে?

* ধর্ম্মের জন্য নরবলি এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল, Sir John Lubbock's Primitive civilisation এবং Prescott's History of Mexico দেখুন। Melanesia এবং আফ্রিকা প্রভৃতি ভূভাগে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

পার্শ্বস্থ সমাজের বিকৃতি।

জয়দেব যেদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশে এই ধর্ম্মের প্রভাব ও কুব্যবহার বঙ্গের অন্যান্য স্থানেরই অনুরূপ। জয়দেবের বাসস্থান অজয়-তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব গ্রাম প্রাচীন সেনভূম পরগনায় অবস্থিত। পূর্ব্বে লুপ লাইনে বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া কিছু দূর গেলেই কেন্দুবিল্ব পাওয়া যাইত, এখন অন্য লাইন হইয়াছে। বোলপুরে পূর্ব্বে লোকের বসতি ছিল না, প্রকাণ্ড প্রান্তর ও জঙ্গল, সেই স্থানে অতি গূঢ়ভাবে কালীর পূজা হইত। সে দেশের কোন বৃদ্ধকে বোলপুর নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে সে জনপ্রবাদের উল্লেখ করিবে যে ইহা বোলপুর নহে "বলিপুর", কালীর নিকট কোন সময়ে সেখানে লক্ষ বলি হইত। বোলপুরের নিকট একস্থানে কঙ্কালী নামে একটী কালীপীঠ আছে—এখনও সেখানে বহুদূর হইতে ভৈরব ভৈরবী ও কাপালিকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কেন্দুবিল্বের মধ্যে জয়দেবের গৃহের সমীপেই শিবালয় বর্ত্তমান ছিল, এখনও আছে। কালীপূজার বিপুল আয়োজন সে গ্রামে না হইত কে বলিতে পারে? কেন্দুবিল্বের অতি সন্নিকটে ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরূপার মন্দির, আজকাল ইহা জঙ্গলে বেষ্টিত। এই কেন্দুবিল্বের সন্নিকটে হিন্দু রাজা সুরথ কর্ত্তৃক স্থাপিত, অজয়-তীরবর্ত্তী সুপুর নামক প্রাচীন সহরে, সুরথ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি আছে, সেখানেও লক্ষ বলি হইত। সুরথেশ্বর নামক শিব এখানে আছেন। কেন্দুবিল্বের উত্তর-পশ্চিমাংশে দুবরাজপুর নামক স্থানের নিকট বক্রেশ্বর (বক্কেশ্বর) তীর্থ। সেখানে অতি প্রাচীন সময়ে শিবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অট্টহাস, নন্দীগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম ও উজানির (উজ্জয়িনী) কালীপীঠ সকল বহু প্রাচীনকালে সংস্থাপিত হইয়াছিল, এগুলি কেন্দুবিল্বের নিকটবর্ত্তী ভূভাগেই অবস্থিত। নান্নুরের

বিশালাক্ষী, মল্লরাজ্যের মৃণ্ময়ী অধিক দূরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত নহেন। চতুষ্পার্শ্বে যত প্রাচীন গ্রাম আছে সকল স্থলেই প্রায় কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং সকলগুলির সঙ্গেই প্রায় লক্ষ বলি বা নরবলির প্রবাদ বিজড়িত। এবম্ভূত দেশে, এবম্ভূত ধর্ম্ম সমাজের মধ্যে, জয়দেব বাল্যাবস্থা ও শিক্ষাবস্থা অতিবাহিত করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার জীবনের প্রায় সমস্ত অংশই এই সমাজের মধ্যে এই সমাজের কার্য্যকলাপ দেখিয়া দেখিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমার বাল্যকালে এই সমস্ত প্রদেশে বর্ত্তমান যুগেও যে প্রকার মদ্য মাংসের চলন ও বলিদান প্রথা দেখিয়াছি তাহা হইতে সে কালের অবস্থা যে কি ভীষণ ছিল তাহা অনায়াসেই ধারণা করিতে পারা যায়।

বীরভূমি কেবল অরণ্যেই পূর্ণ ছিল না, বঙ্গের অন্যান্য সভ্য ভূভাগের ন্যায় ইহারও অধিকাংশ স্থলে বহুদিন হইতে প্রাচীন সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ইংরাজের বিভাগানুসারে অতি অল্প পরিমিতস্থান বীরভূম জেলায় পরিণত হইয়াছে কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার চতুর্গুণ স্থান বীরভূমের অন্তর্গত ছিল। দেওঘর বা বৈদ্যনাথ, খুব বেশীদিনের কথা নহে, বীরভূমি হইতে পৃথক্ হইয়াছে। মুরশিদাবাদের ফতেসিং প্রভৃতি পরগণাও বীরভূমের অন্তর্গত ছিল; বিষ্ণুপুরের রাজাদের রাজ্যও ইংরাজের প্রথম আমলে বীরভূমের সহিত সংযুক্ত জেলার মধ্যেই পরিগণিত ছিল, কালে দুই জেলায় পৃথক কালেক্টর নিযুক্ত হয়। এই বিস্তৃত বীরভূম রাজ্য বঙ্গদেশের রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেও তাহা বহুকাল স্বাধীনভাবাপন্ন ছিল। বিষ্ণুপুর বিভাগও মোগল গভর্ণমেণ্টের সময় পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। বঙ্গদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বলিয়া বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবার জন্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য বীরভূমিকে প্রাচীনকালে সৈন্য রাখিতে হইত। শ্লীপদভর কাতর প্লীহারোগাক্রান্ত আধুনিক বীরভূমবাসীর ন্যায় লোক রোধ হয়

প্রাচীনকালে সে দেশে দেখা যাইত না। রাজমহল হইতে মেদিনীপুরের সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গের সমস্ত পশ্চিমাংশ একদিন মল্লভূমি নামে কথিত হইয়াছে। বীরভূমিও সেই মল্লভূমির অন্তর্গত। লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি বড় বড় বীর যেদেশে বীরত্বের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে বীরভূমি আখ্যা না দিয়া কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? সেকালের লোক এই বীরভূমির লোককে খুব বলশালী দেখিয়া মনে করিত বুঝি অজয়ের সমীপবর্ত্তী বলিয়া সেখানকার সকল অধিবাসী ইছাই ঘোষের ন্যায় অজেয়, তাই দেশ বিদেশ হইতে পিতামাতা সন্তানগণকে "অজেয়" করিবার জন্য অজয় নদে স্নান করাইতে লইয়া আসিত। বীরভূমের মাটীকে বিষ্ণুপুরের রাজারা এক সময় "বীরমাটী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।*

বিস্তৃত বীরভূমির মৃত্তিকা ধান্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন সময় হইতে অর্থাগমের প্রধান উপায় কোন শিল্পবিদ্যার অনুশীলন সে দেশে হয় নাই কিন্তু শস্য উৎপাদনের দ্বারা এখানকার অধিবাসীগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। বন্যার সময় অজয়তীরবর্ত্তী সুপুর, সাকরকন্দা ও কাটোয়া নামক প্রসিদ্ধ চাউলের বন্দর হইতে সেকালের মহাজনেরা রাজধানী

* আধুনিক বীরভূমবাসীকে দেখিয়া বীরভূম নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইয়াছেন। অনেকে সেই জন্য মনে করেন বীরভূমি সাঁওতালী "বির" শব্দ হইতে উৎপন্ন। সাঁওতালীতে "বির" অর্থ জঙ্গল সুতরাং বীরভূমির অর্থ জঙ্গলভূমি। এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। হিন্দুদিগের, একটা হিন্দু ও একটা সাঁওতালী শব্দ লইয়া নাম গঠন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং সাঁওতালদেরও তদ্রূপ কোন প্রয়োজন থাকিবার কারণ নাই। অতি প্রাচীন কালে বীরভূমিতে সাঁওতাল ছিল না, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগেই সে দেশে সাঁওতাল আসিয়াছে। লাউসেন, ইছাই ঘোষ ও মল্লভূমের স্বাধীন রাজাদের কথা বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ থাকায় এদেশ বীরভূম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। জয়দেবের সময় এ প্রদেশের কি নাম ছিল স্থিরীকৃত হয় নাই।

নদীয়া ও অন্যান্য স্থানে চাউল সরবরাহ করিত। মুসলমানদিগের সময়ও বীরভূমির আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—টাকায় চারিসের ঘী, ষোলটা পাঁঠা এ সকল স্বপ্ন বা গাঁজাখুরী গল্প নহে, সত্য কথা। ইংরাজের আমলে লোকসংখ্যাধিক্যবশতঃ জমী কম ও জমীর মূল্য অত্যধিক হইলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান্য সে দেশে জন্মে এবং বঙ্গের চাকুরীজীবী লোকাপেক্ষা সে দেশের লোকের অবস্থা বরং ভাল।

কোন দেশের বা কোন জাতির এইরূপ সুখসমৃদ্ধি হইলে, শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সচ্ছলতা এই ভাবে বর্ত্তমান থাকিলে, হয় তাহা সভ্যতা ও বিদ্যাচর্চ্চার দিকে অগ্রসর হইবে, না হয়, অধঃপতনের পথ খুঁজিবে। একটী মনুষ্যের বিষয়ে যে নিয়ম একটী সমগ্র সমাজ বা জাতির পক্ষেও সেই নিয়ম। সুতরাং যখন তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের কদাচার সমূহ দেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে তখন এই প্রদেশের লোক যে অন্য পথ খুঁজিয়া লইবে তাহা অসম্ভব। বীরভূমির সুখসমৃদ্ধির মধ্যে তান্ত্রিক আবর্জনা আসিয়া পড়িল। কৃষক মদ্যপান করিয়া ক্ষেত্রের কার্য্য প্রায় সেইরূপ করিয়া যায় কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতিগণ ভৈরবীচক্রের আয়োজন করেন, স্ত্রীলোককে উলাঙ্গিনীবেশে সম্মুখে রাখিয়া তাহার সামনে চিত্তসংযমের ব্যবস্থা করেন, স্ত্রীলোকের সহিত কুৎসিৎ ভাবে মগ্ন হইয়া মন্ত্র জপ করেন এবং ভৈরবীমণ্ডলমধ্যে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকেও পথ দেখাইয়া দেন। যেখানে অন্নচিন্তা নাই, জীবন-সংগ্রাম নাই, সেই স্থানেই দুর্নীতি ও কুকার্য্য পূর্ণমাত্রায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও বহুদিন পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হইয়া সমাজের মধ্যে থাকিয়া যায়। এই সভ্যতার যুগে নব্যজগতের চিন্তাস্রোতে দেশের পূর্ব্ব সংস্কার বা কদাচার দুর হইয়া যাইতেছে কিন্তু প্রাচীন কালে যে বিস্তৃত দেশ বীরভূম বলিয়া কথিত হইত তাহার মধ্যে এমন দুই একটী স্থান এখনও আছে যেখানে আজিও হিন্দু বিধবাগণ মদ্যের

মধ্যে আতপ তণ্ডুল ভিজাইয়া তাহারই দুই একটী খাইয়া পর্ব্ববিশেষে নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এই সকল বিধির অভিনয় হইতেছিল। বিক্রমপুর, গৌড়, নবদ্বীপ, তমলুক, দেশের সর্ব্বাংশের কোন স্থলেই বাকী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আর এ প্রকার প্রলোভনপূর্ণ বিধি বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া যে অন্য দেশেও সংক্রামিত না হইয়াছে তাহাই বা কে বলিতে পারে? জয়দেব যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই ধর্ম্মের মধ্যে যতগুলি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বিধি স্থান পাইয়াছিল সবগুলিই তখন অনুষ্ঠিত হইতেছে। সেই সমাজের মধ্যে জয়দেব বাল্যাবস্থা অতিবাহিত করিলেন, সেই সমাজের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা করিলেন, সেই সমাজের মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মমত সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তারপর সম্ভবতঃ সেই সমাজ ও সংসারের প্রতি অশ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া পরিব্রাজক অবস্থায় দেশ হইতে চলিয়া গেলেন। কতদিন তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন বলা যায় না কিন্তু পর্য্যটন হইতে যে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিলেন তাহারই প্রভাবে কুধর্ম্ম দেশ হইতে বিদূরিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইল। গীত-গোবিন্দ বাল্যকালের বা প্রথম যৌবনের লেখা নহে, ইহা বিবাহিত জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা।

উদ্ভাবিত পন্থা।

ভৈরবীচক্রমধ্যে জাতিবিচার নাই; জয়দেব বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিলেন, এস, এস, আমিও একটা এমন ধর্ম্ম বঙ্গদেশে আনিয়াছি, যাহার মধ্যে তোমরা জাতির সংকীর্ণ বন্ধন পাইবে না। যাহার বলে আমি চারি বর্ণ ও নিখিল সম্প্রদায় এক করিয়া দিব।* অমন বীভৎস অভিনয় করিয়া জাতি

* জয়দেবের জীবনী অংশ দ্রষ্টব্য।

তাড়াইতে হইবে না, এ অতি সুন্দর পন্থা। মধ্যভারতবর্ষে রামানন্দ-পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উড়িষ্যায় বৌদ্ধের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্গ রূপ) তিন মূর্ত্তি জগন্নাথের তিন মূর্ত্তিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া বৌদ্ধের জাতিভেদ দূরীকরণ চেষ্টা জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিতরণে পুনঃ প্রচারিত হইতেছে। সেই ধ্বনি জয়দেবের পন্থায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বঙ্গদেশে এক অভিনব ধর্ম্মেরসৃষ্টি করিল। চৈতন্যদেব জয়দেবেরই প্রদর্শিত পথ বাঙ্গালীকে চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রচুর মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকা অপেক্ষা পনর আনা কুনীতি-পরায়ণ লোক অল্প পরিমাণে বা মাঝামাঝি পরিমাণে মদ খাইয়া স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ করাকেই প্রশস্ত মনে করে। মদ ও স্ত্রীলোক যদি আমোদের প্রধান উদ্দেশ্য ধরা যায় তাহা হইলে নিমচাঁদের মত একমাত্র মদই খুব অল্পসংখ্যক লোকের উদ্দেশ্য, কিন্তু স্ত্রীলোক পনর আনারও বেশী লোকের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ মুক্তিলাভই যখন আত্মার উদ্দেশ্য, তখন সর্ব্বসাধারণে বিবসনা নারী লইয়া তাহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সে মুক্তিলাভ না করে কেন? স্ত্রীলোকের সহিত কুৎসিৎ আমোদ যখন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, মানুষ তখন একটী মাত্র স্ত্রীলোক লইয়া চিরদিন সে উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হয় না। খুব কম লোকেই বোধ হয় সস্ত্রীক এই ধর্ম্মাচরণে সক্ষম হইত। অধিকাংশ লোক অন্য পন্থায় পা দিল তাহা আরও ভীষণ। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার সত্যপ্রকাশ নামক গ্রন্থে চোলি পর্ব্ব নামক যে প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পড়িলে হৃৎকম্প না হইয়া থাকিতে পারে না। বঙ্গদেশের যেদিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই ঘৃণিত দৃশ্য। মানুষ পশু হইয়া উঠিতেছে, মানুষ মনের সুকুমার বৃত্তি ভুলিয়া যাইতেছে, চেতন আবিলতাপূর্ণ জড় গর্ভে লুক্কায়িত হইতেছে। জয়দেব তাহাই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এ অবস্থার উচ্ছেদ হয় কিরূপে? চিন্তার বিষয়।

জয়দেব

মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া'যায় যে, যখনই কোন প্রবর্ত্তিত নিয়ম বা ধর্ম্ম কুৎসিৎ আকার ধারণ করে, তখনই নূতন মত পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হয় এবং তখনই একজন সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন; অনেকক্ষেত্রে একজন অগ্রবর্ত্তী সংস্কারক সেই সংস্কারকের আগমন-বার্ত্তা মানুষকে বলিয়া দেয়—লোকের মন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। Wycliffe অনেকদিন পূর্ব্বে Reformation এর বার্ত্তা য়ুরোপকে বলিয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্যের জন্মগ্রহণের অনেক পূর্ব্বে জয়দেব বঙ্গীয়-সমাজ-সংস্কারের কথা লোককে শুনাইয়া রাখিলেন। চৈতন্যও তান্ত্রিক কদাচারের বিরোধী, কিন্তু তিনি একদিনে এই ধর্ম্মের প্রতি ভ্রূকুটী বিদ্বেষ দেখাইয়া এত লোকের মন তাঁহার ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন ইহা সম্ভব নয়, লোকের মন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যদি পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালীকে এত মুগ্ধ না করিত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস যদি সেই গীতের প্রতিধ্বনি না গাহিতেন, তাহা হইলে সেই ভীষণ তান্ত্রিকতা বিধ্বস্ত বাঙ্গালীর কর্কশ মনের মধ্যে হঠাৎ চৈতন্যের প্রেমভক্তি অতটা ক্ষমতা সঞ্চার করিতে পারিত না। চৈতন্য ও জয়দেবে পার্থক্য এইটুকু যে চৈতন্য কর্ম্মবীর ও জয়দেব কবি। পৃথিবীর সকল কবিই যেমন কর্ম্মের ধার ধারেন না, সত্যের মূর্ত্তি মানুষকে দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন, তার অধিক আর কিছু করিতে পারেন না, জয়দেবও তাই। চৈতন্য দেশে দেশে গিয়া প্রচার করেন, প্রেমে বিভোর হইয়া কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়েন, তাই দেখিয়া মানুষের মন প্রেমে ও ভক্তিতে পাগল হয়, জয়দেব নদীতীরবর্ত্তী বসন্তকুসুমফুল্ল-প্রকৃতিমধ্যস্থ মনোরম পদ্মময় কুটীরে বসিয়া নিজের মনেই গান গাহিয়া থাকেন, যদি মানুষ সে সঙ্গীত আসিয়া শোনে শুনুক। কিন্তু সে সঙ্গীতের এমনই আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে তাহার ঈষৎ রাগালাপ মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া মানুষ তাহা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তীব্র রৌদ্রতপ্ত শুষ্কপ্রাণে বর্ষার

নূতন বারি বর্ষণের মত তাহা বড় মধুর লাগিল; জনাকীর্ণ হাটবাজারের অতি ব্যস্ত লোক-সমাগম মধ্যে মধুর সঙ্গীত গাহিলে লোকে যেমন কার্য্য স্থগিত রাখিয়াও তাহাতে মনোযোগ দেয়, সেইরূপ কর্ম্মের ব্যস্তক্ষেত্রে সেই তান্ত্রিক-রাজ্যে লোকে নিজ নিজ কর্ম্ম ক্ষণেকের জন্যও পরিহার করিয়া সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের দিকে উৎকর্ণ হইয়া থাকিল। সে বড় মধুর সঙ্গীত, তাহাতে সর্গের সুর মাখা ছিল।

সমালোচক বলিতে পারেন যে জয়দেব যদি রাধাকৃষ্ণের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সংস্কারকেরই কার্য্য করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তিনি অমন কুৎসিৎ বর্ণনা বা কুৎসিত বিষয়ের বর্ণনা চক্ষের সামনে ধরিয়া লোকের মন সেই কুৎসিৎ দিকেই আকৃষ্ট করিতে গেলেন কেন? একেই কি সমাজ-সংস্কার বলে? তাঁহার পুস্তকের পাতে পাতে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে এত আবিলতা কেন? তাঁহার বর্ণনার বিষয় উদার নহে কেন? ইহার মধ্যে সুনীতির উচ্চ আদর্শ কই? ঐ সম্ভোগ-বর্ণনা কি সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা? শিথিলীকৃত-জঘনদুকুলম্, পয়োধরপরিসরমর্দ্দনম্, অপিধানং জঘনং, পরিপতিতোরসি-রতিরণধীরা, কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ—যে পুস্তকে পদে পদে এ প্রকার কুভাববিশিষ্ট কথা আছে তাহাকে কি সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা বলে?

সমালোচকের কথা ঠিক। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দ কি আজ কালিকার এই বিংশশতাব্দীর সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছে? যেমন ব্যাধি ও যে প্রকার ক্ষেত্র, কবিরাজ সেইরূপ ঔষধই প্রয়োগ করেন; যেমন শরীরের গঠন ও প্রকৃতি, তদনুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করাতেই কবিরাজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়, রোগীও বাঁচিয়া উঠে। যে বালক উন্মার্গগামী, লেখাপড়া করিতে চাহে না, তাহাকে শিখাইবার জন্য বিষ্ণুশর্ম্মার ন্যায় শিক্ষকের প্রয়োজন। যে যে নেশায় আসক্ত তাহাকে সেই নেশার সাহায্যেই পথে আনিতে হয়। যে লোক ভালবাসার জন্য পাগল,

আমি যদি তাহাকে দুটো ভালবাসাসম্বন্ধীয় কথা শুনাই তাহা হইলে তার কেমন হৃদয়গ্রাহী হয়! যে লোকটা চোর, চুরীর ফন্দীর গল্প সে কেমন উৎকর্ণ হইয়া শোনে! যে বালক ক্রীড়াসক্ত, ক্রীড়ার উদাহরণ তাহার মনোযোগ কেমন আকর্ষণ করে ও কত অল্প চেষ্টাতেই সে বুঝিতে সক্ষম হয়! আর যে লোকটা কালের কুনীতিতে মগ্ন তাহার নিকট সম্ভোগের কথা ও সম্ভোগ বর্ণনাই কি সুখপ্রদ হইবে না? আমি যদি চতুর লোক হই, তবে তাহারই মধ্যে আমার মনের অভিসন্ধি লুকাইয়া রাখিব; এ পথের দিকে একবার পা দিলে একদিনে না হউক, বৎসরেকেও তাহাকে সেই পথের উপর আসিয়া পড়িতেই হইবে। জয়দেব যদি সেই তন্ত্রের রাজ্যে শুকদেবের ন্যায় দুটো কথা বলিতে যাইতেন, জনপ্রাণীও তাহা হইলে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত না। পাপের স্রোত তিলমাত্রও ফিরিত না, সমাজের অবস্থা বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইত না। সেই জন্যই জয়দেব বাছিয়া বাছিয়া তদনুরূপ বিষয় মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ত রামসীতারও ভজনা করিয়া থাকে, কিন্তু গীত-গোবিন্দ সে পথে গেল না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, সে কথাও পুরাণে ছিল কিন্তু তাহা সে কালের বঙ্গদেশের ঔষধ নহে, ভিন্ন প্রদেশের হইতে পারে। গীতগোবিন্দ যে বিষয়ের ও যে মধুরত্বের বর্ণনা করিয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই সে কালের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইত না।

গীতগোবিন্দের বর্ণনাচাতুর্য্য এতই ক্ষমতাবিশিষ্ট যে তাহা আমাদিগকে অতি উচ্চশ্রেণীস্থ কবিত্ব দেখাইয়া দিতেছে বটে কিন্তু তাহাতে মন লইয়া বর্ণনা বা চেতনের অংশ অল্পই আছে; এবং যতটুকু আছে তাও সকলে দেখিতে পায় না; তীব্র শারীরিক সুখের কথা ও তাহারই সুস্পষ্ট বর্ণনায় সব ঢাকিয়া যায়। জয়দেবের উদ্দেশ্যও তাহাই। জয়দেব সেই বর্ণনাকে

কবিত্বের সুন্দর সজ্জায় প্রতিফলিত করিয়া কালের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। কদাচার মনের সুকুমার ভাব দিয়া নষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কবিত্বমাখা সুললিত বর্ণনায় নিকৃষ্টত্বমাখা কুধর্ম্ম বিনাশ করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু যহারা ভীষণ তান্ত্রিক, পশুবধ, মদ্যপান, শবসাধনা প্রভৃতি নিকৃষ্ট কদাচারে যাহাদের চিত্ত জড়-পিণ্ডবৎ হইয়া গিয়াছে তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম আহ্বান করিলেন কি? যাহাদের হৃদয়ের নিকট কবিত্বের সকল ক্ষমতা চূর্ণ হইয়া যায়, তাদের কর্ণে জয়দেব-সঙ্গীত যে কোন আঘাত করিতে পারে তাতো বোধ হয় না। শুনিয়াছি জগাই মাধাই নবদ্বীপ সহরের পুলিশ সব ইন্সপেক্টর ছিল, একদিকে তাহারা যেমন ঘোর তান্ত্রিক, অন্য দিকে তেমনি বর্ত্তমান যুগেরই পুলিশ কর্ম্মচারীর ন্যায় শুষ্ক ও কর্কশচিত্ত; সে প্রকার ব্যক্তিকে পথে আনা কর্ম্মবীরের কার্য্য। কবির কার্য্য নয়। কিন্তু তত্রাপি জয়দেবের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া সে প্রকার ব্যক্তির চিত্তও যে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত না হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে?

প্রক্রিয়া।

কেহ কেহ বলিবেন বেশ কথা, কিন্তু গীতগোবিন্দের মধ্যে প্রদর্শিত ধর্ম্ম কোন থানে? তান্ত্রিকযুগে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত করাই গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম ও জয়দেবের জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই গীতগোবিন্দের প্রণয়ন।

গ্রন্থের ভূমিকাতেই জয়দেব পাঠককে বলিয়া দিয়াছেন "যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্" এক সঙ্গে যদি দুই জিনিস দেখিতে চাও, হরিকেও স্মরণ করিতে চাও আর প্রেমের অভিনয় বা প্রেমের বিজ্ঞানও শিখিতে বা অনুভব করিতে চাও, তবে জয়দেবের বই

শুনিবে এস। একসঙ্গে দুই জিনিস দেখাইয়া গ্রন্থের সমাপ্তিতে কবি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন—যাহাকে শৃঙ্গারবিবেক তত্ত্ব বল আর যাহাকে বৈষ্ণবের অনুধ্যান বল, হে সুধীবর্গ, সেই সমস্তগুলি যে কাব্য লিখিত হইল তার মধ্য হইতে একটী একটী করিয়া শোধন করিয়া লও যে ঠিক লিখিত হইয়াছে কি না *। ভূমিকায় ও গ্রন্থসমাপ্তিতে এই দুইটী কথা পাঠককে বলা হইয়াছে এবং প্রলোভনের সঙ্গেই ধর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে।

কিন্তু তবে ত গীতগোবিন্দকে প্রলোভন মাত্র বলিতে হইবে? হাঁ, দুষ্টকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রলোভনের আবশ্যকতা হয়। শাস্ত্রে ইহার উদাহরণ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মেও প্রলোভনপন্থা আছে। সে প্রলোভন আনুসঙ্গিক ভাবে জয়দেব পুস্তকের মধ্যে, কেহ স্পষ্টতঃ না বুঝিতে পারে এমন ভাবে, সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াই স্থানে স্থানে অশ্লীলতাবিকৃতি ঘটাইয়াছেন।

তাঁহার প্রথম প্রলোভন—ক্ষুদ্র পুস্তকে অল্প কথায় নায়ক নায়িকাঘটিত প্রেমের বর্ণনা। বিরাট মহাকাব্যে নহে—যাহা তিন চারি ঘণ্টায় গাওয়া ও কথকতায় সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে এমন পুস্তকে। দ্বিতীয় প্রলোভন-প্রেমের কার্য্যপরম্পরা মধ্যে দীর্ঘ হাহুতাশরূপ অন্য কোন রস না প্রকটিত করিয়া সেকালের ঔবধানুযায়ী সম্ভোগের চিত্রাঙ্কন ও নায়ক নায়িকার চরিত্রের উন্মত্ত ব্যবহার। তৃতীয় প্রলোভন—যে সকল বিহারের কথা সাধারণের জ্ঞানগম্য ছিল না, বাৎস্যায়ন বা ভরতোক্ত "মনসিজতন্ত্র" সমূহ হইতে সেই সকল কথা লইয়া তাঁহার বর্ণিত পালার মধ্যে মধ্যে সময়ের সমতা রাখিয়া সেই কথার বর্ণনা। এবং পুস্তকের মধ্যে বর্ণনাচ্ছলে সেকালের রীতি অনুসারে কাব্যসৌন্দর্য্যের খাতিরে বর্ত্তমান রুচিবিরুদ্ধ কোন কোন কথার

* ১২—২৮ শ্লোক।

উল্লেখ। চতুর্থ প্রলোভন—রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমাত্মক, বর্ণিত লীলা ব্যতীত অন্যান্য লীলার, মধুর ঘটনার স্মৃতির চিত্রাঙ্কন। আশীর্ব্বচন সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রলোভন তাঁহার ঈশ্বর প্রণোদিত কবিত্ব ও সঙ্গীতের নূতনত্ব—যাহা ভারতবর্ষে কখনও ছিল না, তাহারই আবিষ্কার। কিন্তু লূতাতন্তু যে প্রস্তুত করে তাহা কত সূক্ষ্ম সে স্বয়ং তাহা বোধ করিতে পারে কি না জানি না। তাহা ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার জিনিস।

প্রথম প্রলোভনসম্বন্ধে কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবেনা। দ্বিতীয়টীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাব্যের নায়ক ও নায়িকার চরিত্রাঙ্কন প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে। তৃতীয় বিষয়টীর সম্বন্ধে এই বলিতে পারা যায় যে কাব্যের কার্য্যকারণপরম্পরার বিষয়ীভূত না হইলেও ইচ্ছা করিয়া জয়দেব দুই তিন স্থানে এ বিষয়ের বর্ণনা এবং পুনরুক্তি করিয়াছেন, দ্বিতীয় সর্গে, পঞ্চম সর্গে ও সপ্তম সর্গে। সে সকল স্থানে ঐ বর্ণনা বর্ণিত লীলার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখে না, জয়দেব তত্রাপি তাঁহা বার বার শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়াছেন। ঐ অংশগুলি পরিত্যাগ করিলেও পুস্তকের কোনই ক্ষতি হইত না। সম্ভোগ বর্ণনা যখন আবশ্যক, শেষ সর্গের মিলনাংশেই ত তাহা পাওয়া যায়, তবে আবার অন্যত্র ওগুলি কেন ? কিন্তু জয়দেব পুস্তকের মধ্যে মধ্যেই শারীরিক সুখের নেশায় মত্ত অন্ধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী ব্যক্তিকে সেই প্রলোভনে মাতাইয়া মাতাইয়া ধাবিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান রুচি ও অশ্লীলতা অংশে কাব্য-দোষের আলোচনার মধ্যে এবিষয় বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে।

চতুর্থ বিষয়। গীতগোবিন্দের মধ্যে অনেকগুলি আশীর্ব্বচন সম্বন্ধীয় শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুস্তকে বর্ণিত লীলার সঙ্গে সেগুলির ঘটনার কোনই সামঞ্জস্য নাই। অনেক টীকাকার সে সামঞ্জস্য টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রত্যেক পাঠকই বুঝিতে সক্ষম

হইবেন যে কোন সামঞ্জস্যই নাই। কৃষ্ণলীলার কোন একটী ঘটনার স্মারকলিপি স্বরূপ আশীর্ব্বচনই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সকল ঘটনা অত্যন্ত কঠোর ও মনোরঞ্জনকারী না হইলেও এমন একটী মধুর স্মৃতির কল্পনা তাহার মধ্যে করা হইয়াছে যে, শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী না হইয়াই থাকিতে পারে না। কোথাও কৃষ্ণের বাহু, কোথাও বক্ষ, কোথাও বংশীরব, কোথাও বচন, অথবা কোথাও বা স্বয়ং কৃষ্ণকে মনে করিয়া ঐ সকল আশীর্ব্বচন প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের একটী একটী প্রেমকুশলতার স্মৃতির কল্পনা !

কংসের কুবলয়াপীড় হস্তীর সহিত কৃষ্ণ যুদ্ধ করিতেছেন, কৃষ্ণ বলবান হইলেও সে হস্তীর বলও কম নহে, সুতরাং কৃষ্ণ কখনও স্বেদার্দ্র ও কখনও নিমীলিতনেত্র হইতেছিলেন ; স্বেদার্দ্র ও নিমীলিতনেত্র হইলে কংসপক্ষের লোক কৃষ্ণেরই পরাজয় মনে করিয়া হর্ষকোলাহল করেতেছিল ; কিন্তু কবি বলিলেন রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন কুবলয়াপীড়েণ—সুবৃহৎ হস্তীকুম্ভ দেখিয়া রাধার পীনোচ্চ পয়োধরযুগল মনে করিয়া সাত্ত্বিকোদয় হওয়ার জন্যই কৃষ্ণ স্বেদার্দ্র ও নিমীলিতনেত্র হইয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষণমাত্র হর্ষকোলাহল হইয়াছিল কিন্তু তখনি কৃষ্ণ সে হস্তীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। সেই কৃষ্ণ, হে শ্রোতৃবর্গ, তোমাদের হর্ষ বর্দ্ধন করুন।

(দশম—১৬)

হস্তীর মস্তকের কুম্ভের বিশালতা দেখিয়া রাধার পয়োধর মনে পড়িয়াছিল এ কল্পনা আর কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মী কিন্তু শিবের ন্যায় সেই কুৎসিৎটার দিকে না চাহিয়া বিষ্ণুকেই স্বয়ংবরে বরণ করিলেন ও শিব বিমূঢ় হইয়া কালকূট সেবন করিলেন। একদিন কৃষ্ণ রাধিকাকে এই পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্যমনস্ক করিয়া দিলেন ও সেই অবকাশে তাঁহার বক্ষের

বসন অপসারিত করিয়া দিয়া নির্ণিমেষ নেত্রে তাঁহার সুন্দর স্তনকোরক দেখিতে লাগিলেন—হে শ্রোতৃবর্গ, সেই হরি তোমাদের রক্ষা করুন।

(দ্বাদশ—২৭)।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্ খানে একথা লিখিত আছে? এমন রসিক ভগবানের শাস্ত্র না দেখিয়া কি আর রক্তাক্তকলেবরা মুণ্ডমালাধারিণী শক্তির দিকে মন যায়? আগমবাগীশের সম্প্রদায় বোধহয় বৈষ্ণবদিগকে এই খানে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

অন্যান্য উদাহরণ বোধহয় আর দেওয়ার আবশ্যকতা নাই, গীত-গোবিন্দের পাঠক এই আশীর্ব্বচন সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কবির গূঢ় উদ্দেশ্য ইহার মধ্যেও লুকায়িত আছে। এরূপ দাম্পত্য-প্রেমের কল্পনা এই সকল শ্লোকে জড়িত না করিয়া জয়দেব কি কোন বিশুদ্ধ আশীর্ব্বচন লিখিতে পারিতেন না?

এখন, একটা কথা মনের মধ্যে উদিত হইতে পারে—জয়দেব স্বয়ং তাঁহার পুস্তকের মধ্যে তাঁহার সময়ের ধর্ম্মবিকৃতির কোন উল্লেখ করিয়াছেন কি না এবং তান্ত্রিক সমাজের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিয়াছেন কি না। যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ, তিনি ভ্রূকুটীবিদ্বেষের সহিত জীবনের কোন সংশ্রব রাখেন না। কালের কুধর্ম্ম যখন প্রবল হয় তখন কবির অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার নিশ্বাসেই তাহা প্রকাশিত হয়। তাঁহার সকল সংগীতের মধ্যে, তাঁহার বিষয়ের কটুত্বের মধ্যেও, তিনি সর্ব্বদাই হরিকে শ্রোতৃবর্গের মনে উদিত হইবার জন্য ডাকিতেছেন। যদি গীতগোবিন্দ শুধু কাব্যমাত্রই হয়, যদি কতকগুলি অসার প্রেমকথা বা দাম্পত্য-সংশ্রব প্রকটিত করিবার জন্য ইহা কেবল কবির কথা হয়, তবে তাঁহার প্রত্যেক গীতে তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা কেন—ও এত ব্যাকুলতাই বা কিজন্য? তাছাড়া তিনি প্রকাশ্যতঃ ও যুগধর্ম্মের বিকৃতির উল্লেখ না করিয়াছেন তাহা নহে।

সপ্তম সর্গে কবি কোন কল্পিতা নারীর সহিত কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা রাধিকার উক্তিতে প্রকটিত করিলেন। যে সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত করিতে ঘৃণা আসে, তাহারই বিপরীত বিহারাবস্থার সৌন্দর্য্য রাধিকা স্বয়ং তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিলেন। রাধিকার মুখে সে কথা অসঙ্গত হইলেও কবি সে সুখ শ্রোতৃবর্গকে অনুভব করাইতে চাহেন। ভণিতায় কবি প্রার্থনা করিলেন রাধিকাকথিত এই রতিকথা যেন কলিযুগের পাপের শমতা বিধান করে। *

ঐ সপ্তম সর্গেই কল্পিতনারীর স্বাধীনভর্তৃকাবস্থা রাধিকার কথায় ব্যক্ত করিয়া ভণিতায় কবি নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, হে প্রভু, আমি তোমারই পদসেবক, তোমারই গুণচিন্তনকারী, তোমারই লীলার বক্তা, এ পৃথিবীত কলিপাপে ভরিয়া গিয়াছে, যেদিকে চাহি সেই দিকেই ঐ দৃশ্য, যেন এই দীন পদসেবকে সেই যুগাচরিত পাপ স্থান না পায়। †

দ্বাদশ সর্গে পুস্তকের শেষে কবি লিখিয়াছেন—হরিচরণ স্মরণ অমৃতের ন্যায় সুখপ্রদ, সেই অমৃতের দ্বারা কলিযুগাচরিত পাপজ্বরের খণ্ডন করে যে বাক্য, সেই বাক্যে হৃদয়কে তৎপর কর। ‡

এই কলিপাতক বা কলিকলুষজ্বর কোন্ সামাজিক কুব্যবহারের উল্লেখে লিখিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। ইহা শুধু অর্থ-বিহীন উক্তি নহে। কবি সকল স্থানেই এই কলিপাতক বিনাশ

* শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ৭-২০

† ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥৭-২৯।

‡ শ্রীজয়দেববচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতকৃতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥১২-২৪॥

করিবার জন্য ব্যস্ত। কবিত্বের মধ্যে, গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, সংস্কারক যাহাকে অশ্লীল বলে সেই অশ্লীলতারূপ তিক্ত রসায়নের মধ্যে, জয়দেবের হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ঐ কলিপাতক নষ্ট হউক। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে যে কলির পাতক বর্ত্তমান, জয়দেব সেই পাতক বিনাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। কবিত্ব দিয়া দুর্নীতি অপসারিত করিবার জন্য সচেষ্ট। আমরা যাহাকে অশ্লীলতা বলি, এত সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে সেই অশ্লীলতার বর্ণনা।

কালের পরিবর্ত্তন।

একমাত্র সৌন্দর্য্যপূজা ব্যতীত গীতগোবিন্দমধ্যে আজকাল অন্য কোন ধর্ম্ম পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারি না। গীতগোবিন্দ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা—যদি আমরা জয়দেবকে সে কালের সমাজের সঙ্গে না দেখি তাহা হইলে ইহার ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারিব না। উচ্চ মানসিক বৃত্তি লইয়া যে কবিত্ব গঠিত হয় তাহার অন্বেষণ যদি আমরা গীতগোবিন্দের মধ্যে করিতে যাই, তাহা হইলে তাহা বৃথা প্রয়াস মাত্র হইবে। বড় বড় কবিদের মত জয়দেব কেন সে কথা লিখিলেন না, অন্ততঃ বিদ্যাপতির মাথুরের ন্যায় দুই চারিটা মানসিক তত্ত্বের সমাবেশও তিনি করিতে পারিতেন, একথা ভাবিয়া যাঁহারা মন খারাপ করেন, তাঁহারা জয়দেব কোন্ সময়ের লোক সে কথা বিচার করেন না।

সাহিত্য শুধু মনের উচ্চ অথবা গম্ভীর অথবা ভীষণ বৃত্তি সমূহ লইয়াই নয়। গীতগোবিন্দের বিষয়ীভূত বর্ণনাও সুকুমার মানসিক বৃত্তির অংশীভূত, তবে তাহার মধ্যে জয়দেবের লেখনী হইতে স্থানে স্থানে যে বিকৃত অংশ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই টুকুর সম্বন্ধেই যে যা বলিতে পারেন। কিন্তু জয়দেব এ পৃথিবীতে একা সে বিষয়ের জন্য দায়ী নহেন। গ্রীক, লাটীন,

ফরাসী, ইংরাজি, পারসী প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যেই ইহার অল্পাধিক প্রমাণ আছে, আর যে সংস্কৃতে জয়দেব কাব্য লিখিয়াছেন সেই সংস্কৃতের বড় বড় লেখকদিগের লেখনীতেও তদ্রূপ বর্ণনা স্থান পাইয়াছে, তবে জয়দেবের ন্যায় অত ব্যক্ত বা স্পষ্ট না হইতে পারে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির একটী অদ্বিতীয় উদাহরণ বলিতে কেহ ইতস্ততঃ করিবেন কি না জানি না, ইহার রচনায় মুগ্ধ না হন এ প্রকার লোক বোধ হয় বিরল। জয়দেবের মধ্যে, আমরা যাহাকে উচ্চ মানসিক তত্ত্ব বলি সে কথার সমাবেশ নাই কেন, এ কথার উত্তর জয়দেবের মন জড়ভাব লইয়া গঠিত বলিয়া কিম্বা তাঁহার মানসিক বৃত্তি বুঝিবার কোন ক্ষমতা ছিল না বলিয়া নহে, কিন্তু যুগের অবস্থা অনুসারে তাহা তাঁহার প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। যুগের সে অবস্থায় মনের অস্তিত্ব বড়ই কম, বাঙ্গালীর মন তখন মনের উচ্চ আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, মন বুঝিবে কে?

বৈরাগী ব্যতীত গীতগোবিন্দের মধ্যে ধর্ম্মের অন্বেষণ আর কেহ করে না। আজকাল গীতগোবিন্দে ধর্ম্মের কথা সুস্পষ্ট কিছুই পাওয়া যায় না। অন্ততঃ এ যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে পারে না। জয়দেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসম্প্রদায় গীতগোবিন্দের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া একটা ধর্ম্মমত গঠিত করিয়াছেন, সেই জন্য গীতগোবিন্দে ধর্ম্মের জনপ্রিয় স্মৃতিমাত্র বর্ত্তমান। ইহার ধর্ম্ম কি তাহা আজ কালিকার পৃথিবী বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেকে কষ্ট-কল্পনা করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যস্ত এবং অনেকে আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়াই নিশ্চিন্ত। কোন সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারের জন্য যে সাহিত্য রচিত হয়, সেই ধর্ম্ম বা সমাজসংস্কার কার্য্য যখন শেষ হইয়া গেল, তখন আর তন্মধ্যে প্রকৃত পদার্থ কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর

সকল সাহিত্যই ভবিষ্যৎ সমাজের নিকট ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। মিল্টনের সাহিত্যও বোধ হয় ক্রমে ক্রমে এই জন্য দুর্ব্বোধ্য হইয়া আসিতেছে। সমাজ পরিবর্ত্তনশীল, সেই জন্য সমাজের অবস্থা বা যুগ বিশেষের আবশ্যকতায় সৃষ্ট যে সাহিত্য, তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায়। যাহা চিরন্তন, সেই মানসিক বৃত্তি লইয়া রচিত যে সাহিত্য তাহা আবহমানকাল পূর্ণ প্রভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং পৃথিবীর দেশদেশান্তরেও আদৃত হইয়া থাকে। মানবসমাজের যতদিন অস্তিত্ব, সেক্সপীয়র বা ভবভূতির অস্তিত্ব ততদিনই থাকিবে, কিন্তু ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত মিল্টনের অস্তিত্ব আর কোথাও নাই। জয়দেবের ধর্ম্ম কালানুসারে কাব্যমধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ঘটে, কিন্তু গীতগোবিন্দ মানবসমাজে চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে। আধুনিক রুচি নিন্দা করুক, ক্ষুদ্র জড় বিষয়ের বর্ণনা বলুক, তাহার মধ্যে কবিত্ব আছে, মনেরই সুকুমার অংশেরই চিত্র অঙ্কিত আছে। তাই যতদিন প্রেম থাকিবে, বিরহ থাকিবে, মানভঞ্জনের হাস্য রসিকতা থাকিবে, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে লোক বিমোহিত হইবে, যতদিন স্ত্রীলোক আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে, গীতগোবিন্দও ততদিন জনসমাজে আদৃত হইবে। কবিত্ব চিরন্তন। গীতগোবিন্দের কবিত্ব যে শুধু ভারতবর্ষের লোক ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, তাহা নহে। ইহা ইউ-রোপের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে—পৃথিবীর কোন অশ্লীল কাব্যের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। বাঙ্গালী সমালোচক চিরদিনই ইহাকে গালি দিক, গীতগোবিন্দের আসন পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য-সমাজ হইতে বা ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে কেহ টলাইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করুক প্রকৃত সাহিত্যা-নুরাগী সে দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না; সে প্রত্নতত্ত্ব পরিত্যক্ত পুরাতন

কাগজের সহিত দুই দিন পরে মিশিয়া যাইবে। বাঙ্গালায় এখনও বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা স্বাধীনচিন্তায় পরাঙ্মুখ নহেন ও তাঁহারা সাহিত্য সমালোচকের মুখে ঝাল খান না, বা এ বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তির কোন মূল্য আছে বলিয়া বিবেচনা করেন না।

প্রাচীন সমাজে ঘাতপ্রতিঘাত।

গীতগোবিন্দ যদি সমাজসংস্কারেরই চেষ্টা বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে সেকালের সমাজের সঙ্গে ইহার কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাত হইয়াছিল তাহা এখনও বলা হয় নাই। জড়ত্বের আদর্শ অসভ্য জাতি যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতে পারে, কর্কশ কঠিন হৃদয়ে যদি চাঁদমুখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হওয়া সম্ভাবিত হয়, ভীষণ নরঘাতীরও অন্তঃকরণ যদি স্নেহরসে আর্দ্র হইবার ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে গীতগোবিন্দ সেকালের জড়ত্বের নিম্নতম সোপানস্থিত সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন হইবে না। প্রলোভন-পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের বৃহৎ ভাণ্ডার সম্মুখে ধরিয়া জয়দেব সে কালের সমাজকে আহ্বান করিলেন, সে সমাজ তিলেকের জন্যও যে নিজকার্য্য স্থগিত রাখিয়া সেদিকে না চাহিয়াছিল কে বলিতে পারে? পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল বৈষ্ণব সাহিত্য প্রণীত হইয়াছে এবং যে সকল বাঙ্গালী বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই জয়দেবের প্রদর্শিত পন্থাবলম্বী; এবং দাস্য, বাৎসল্য, প্রভৃতি পন্থা অপেক্ষা এই পন্থাই যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যে বিষয়ের কার্য্যকরী ক্ষমতা অতি কম তাহা সমাজে দাঁড়াইতে পারে না। জয়দেবপ্রদর্শিত পন্থা যখন পরবর্ত্তী সময়ে সমাজে এতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তখন নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে সেকালের সমাজে

জয়দেবের অধিপত্য লোকে খুব অধিক অনুভব করিয়াছিল। যদি তাহার ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে তাহার উন্নতি এতদূর না হইয়া লোকে শীঘ্রই সে মত পরিহার করিত।

তারপর গীতগোবিন্দ কবিত্ব ও সঙ্গীতের অমূল্য ভাণ্ডার। সুরলয়-বিহীন, থিয়েটারের একটা অপদার্থ সঙ্গীত কলিকাতায় গীত হইবার এক সপ্তাহ মধ্যেই বাঙ্গলাদেশের গ্রামে গ্রামে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে পর্য্যন্ত, যদি প্রচলিত হইতে পারে, তাহা হইলে অমূল্য-কবিত্ব-মাখা উচ্চ রাগরাগিণী সম্বলিত গীতগোবিন্দ যে অতি অল্প দিন মধ্যেই গ্রামে গ্রামে, পথে পথে, প্রান্তরে প্রান্তরে, প্রতিধ্বনিত হইবে, ও তীর্থযাত্রীর মুখে মুখে দেশ দেশান্তরে ধাবিত হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা কবিত্বা-নুরাগী, তাঁহারা কবিত্বরস অনুভব করিবার জন্যও পড়িতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, সুতরাং পরোক্ষভাবেও গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। গীত-গোবিন্দ একাধারে ধর্ম্ম, সঙ্গীত ও কবিত্বের সংমিশ্রণ, সকলগুলিই সেকালে একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছে।

গীতগোবিন্দের সঙ্গে আরও একটা বহুমূল্য স্মৃতি বিজড়িত আছে—দেহি পদপল্লবমুদারং। বৈষ্ণব বলে ভগবান স্বয়ং এটুকু পদ যোজনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কেমন করিয়া কি ভাবে কথাটা উঠিয়াছে, অথবা জয়দেবের জীবনকালেই উঠিয়াছে কি না, বলা যায় না, কিন্তু এই স্মৃতি গীতগোবিন্দের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য লোকে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যে গীতগোবিন্দের ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছিল তাহা সহ-জেই অনুমিত হইতে পারে।* হয়ত ভক্ত জয়দেবের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হইয়াছিলেন, হয়ত জয়দেব অমনোযোগিতাবশতঃ স্বয়ং লিখিয়া এত বড় কথাটা কি করিয়া লেখা হইল বলিয়া সন্দিহান হইয়াছিলেন,হয়ত কাব্যদোষ

* জীবনচরিত অংশ দ্রষ্টব্য।

বা ধর্ম্মদোষ বা রুচিদোষ প্রদর্শনের জন্য আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় এ গল্পের আবিষ্কার হইয়াছিল, হয়ত তাঁহারই ধর্ম্মের গরিমা প্রদর্শনের জন্য তান্ত্রিক-সম্প্রদায়কে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে এ স্মৃতির আরোপ হইয়াছিল, যে ভাবেই হউক ঐ একটী ছত্রের সঙ্গে ঐ স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার জন্য ইহা যে গ্রন্থ ও ধর্ম্মপ্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তাহাতে কোনই ভুল নাই। স্বয়ং ভগবান আসিয়া যে পুস্তক লেখেন, তাহাই যে মানবজাতির ধর্ম্ম নয়, এ বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারে ? আজিও বৈষ্ণব, ও যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা কখনই এ গল্পে সন্দেহ করিবে না বা ইহাকে অলৌকিক গল্প মনে করিবে না। যে ইউরোপীয় দার্শনিক এত বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছেন, তাঁহারাও যীশু খ্রীষ্টের বা সেণ্টপলের অলৌকিকতায় সন্দেহ করেন না। জয়দেবের জীবন ও গীতগোবিন্দের সঙ্গীতের সঙ্গে আরও যে সকল অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে, সকলগুলিই গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করিয়াছে।

আরও একটা কারণে গীতগোবিন্দের বহুল প্রচার হইয়াছিল—তাহা ইহার ভাষা। পূর্ব্বে যত সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইত, অধিকাংশই খুঁজিয়া খুঁজিয়া অভিধানের রূঢ় ভাষা লইয়া রচিত হইত। জয়দেব সে রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া অভিধানের অতি সরল, প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট ভাষা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যে ভাষা কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, যাহার শব্দসংগ্রহ চলিত ভাষার মধ্যে পাওয়া যায় না, লোকে কখনই তাহা ইচ্ছা করিয়া পড়িতে বা শুনিতে চায় না। গীতগোবিন্দের ভাষা তাহা নহে। এ ভাষা প্রচলিত বাঙ্গলা, বিদেশীয়-শব্দ-বর্জ্জিত হিন্দী বা উৎকলের ভাষারই শব্দভাণ্ডার হইতে গঠিত, কেবল সংস্কৃতের শৃঙ্খলা ও সজ্জায় বিভূষিত। এজন্য উৎকল, মিথিলা বা বঙ্গ কোন দেশেরই লোক

তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃতের ন্যায় ইহাকে দূরে রাখে নাই। দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিলেও ইহার অনুপ্রাস ও সঙ্গীতের রাগে সকলকেই সেদিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

কেন্দুলিতে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন যে মেলা বসে, জয়দেব স্বয়ং যদি এই মেলার সৃষ্টি করিয়া থাকেন (এ বিষয়ে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখা যায় না, কারণ সাড়ে তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত বনমালী দাসের জয়দেব জীবনীতে এ কথা উক্ত হইয়াছে) তাহা হইলে সেই মেলায় গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া এই পুস্তক ও এই ধর্ম্ম অতি অল্প দিনেই দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

গাহিবার জন্য এবং গাহিয়া প্রচার করিবার জন্যই গীতগোবিন্দের গান রচিত হইয়াছিল। ইহা গোবিন্দবিষয়ক গান, কাব্য নাম দেওয়া হয় নাই। জয়দেব স্বয়ং গায়ক ছিলেন, তাছাড়া এই গীত গাহিবার জন্য একটী সম্প্রদায় বা দলও গঠিত করিয়াছিলেন। সেই দলের নেতা বা মূলগায়েন, সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ রাগরাগিনীবেত্তা পরাশর নামক তাঁহার কোন একজন সহায়ক। গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া দেশ বিদেশে বিস্তারের জন্য জয়দেব উল্লাসভরে গীতগোবিন্দকে তাঁহার ও তাঁহার সহকারী* গায়কদিগের হস্তে এই কবিত্ব ও এই ধর্ম্ম সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে দেশে গাহিয়া ও কথকতা করিয়া বেড়াইতেন।

গীতগোবিন্দের ধর্ম্ম জয়দেবের সময় হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সময় বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে ঘরে রাধামাধব,রাধারমণ, রাধাদামোদর প্রভৃতি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা জয়দেবের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

---

* পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু—পরাশর আদি, একা পরাশর নহেন। ১২—৩০

জয়দেব

আবার বঙ্গদেশে এত বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব, এত যাত্রা, এত অভিনয়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এত বদ্ধমূল হরিকথা, পল্লীতে পল্লীতে এত কৃষ্ণ সঙ্গীতের দল, কথায় কথায় এত রাধাকৃষ্ণপ্রেমের উপমা—ইহার সকলের মূল জয়দেব।

প্রত্যেক কার্য্যেরই ভাল ও মন্দ দুইটা পার্শ্ব আছে—জয়দেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সম্বন্ধেও একথা খাটে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা সঠিক বলিতে পারিতেছি না—কিন্তু বাঙ্গালীকেই কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা খুঁজিতে হয়, কারণ বাঙ্গলাতেই কৃষ্ণচরিত্র অতি মলিন আকার ধারণ করিয়াছে। গৌরাঙ্গ নিজের ভাবেই উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন আর তাঁহারই জীবনের সেই প্রেম ও ভাব দেখিয়াই মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র কি, তিনি যে মনুষ্যকে কতটা বুঝাইয়া গিয়াছেন বলিতে পারি না। গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গকে অবতার বা ঈশ্বর বলিয়া তাঁহারই গুণগানে বঙ্গদেশ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন—কৃষ্ণচরিত্র কি, তাঁহারাও ভাল করিয়া বাঙ্গালীকে বুঝিতে দিলেন না। কৃষ্ণ ও রাধা রহিলেন কবির হাতে—সেই কবি কল্পনাবলে লম্পট, বসনচোর, ষোলশ' গোপিনীর মনভুলান নটবর, এই সব ভাবের বড় বড় ব্যাপারে কৃষ্ণকে রঞ্জিত করিয়া দিল। ললিতা আসিল, বিশাখা আসিল, বৃন্দা আসিল, কুব্জা আসিল, যে যেখানে লুকায়িত ছিল আপন আপন কুটিল কর্ত্তব্য লইয়া সব বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া কবির কৃষ্ণচরিত্র ভরপুর করিয়া ফেলিল। যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, ঢপওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা যে যেখানে ছিল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া যতদূর মলিনতা সম্ভব কৃষ্ণচরিত্রে চাপাইয়া দিল। তারপর কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার শান্তিপুরে রাসের ছবি গড়াইয়া দেশে দেশে তাহার আদর্শ প্রচার করিয়া দিল ও বটতলার পটওয়ালা পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকের ঘরে ঘরে ও বেণে ময়রার দোকানে দোকানে

সেই কৃষ্ণচরিত্র প্রচার করিয়া করিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিলে কলিকাতার আর্ট ষ্টুডিও আরও রঙ মাখাইয়া তাহা বাঙ্গালীকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

বঙ্গদেশের কবির কথায় এবং চিত্রকরের তুলিকায় কৃষ্ণের কেবল এই মূর্ত্তিই দেখা গিয়া থাকে। বঙ্গদেশের যেখানে দেখিবে সেই খানেই নূপুর পায়ে ত্রিভঙ্গ বংশীধারী, বসনচোর বা গোপিনীর সঙ্গে জড়াজড়ি ভিন্ন প্রায় অন্য মূর্ত্তি কোথাও নাই। ননীচোর বা লাড়ুয়া গোপাল আদি কচিৎ দেখা যায়। কৃষ্ণের প্রেমিক মূর্ত্তি বা লম্পট মূর্ত্তিই বাঙ্গালী অঙ্কিত করিয়াছে কিন্তু সে চরিত্রের অন্য কোন অংশের দিকে মনঃসংযোগ করে নাই। জয়দেব এ সূত্রপাত করিয়া না দিলে বঙ্গদেশে কৃষ্ণচরিত্র এত কালিমা মলিন হইয়া ফুটিয়া উঠিত না এবং বড় বড় শিক্ষিত বাঙ্গালীকেও কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার প্রয়াস করিতে হইত না।

ধর্ম্ম পুরাতন হইলে ও সমাজমত পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রচলিত নিয়ম বা ধর্ম্মের মধ্যে অনেক কদাচার জন্মগ্রহণ করে। বঙ্গদেশে যদি তাহা করিয়া থাকে জয়দেব তাহার জন্য দায়ী নহেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই সে পন্থা ঠিক রাখিতে পারেন নাই।

জয়দেবের কাব্য সমালোচনা বা জীবনচরিত সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। যে পুস্তক স্যাফো কিম্বা বাইরণের লেখার সঙ্গে, মেঘদূত অথবা চোরপঞ্চাশিকার সঙ্গে একত্র রাখিলে ভাল হয় তাহাকে লইয়া আমরা চৈতন্যচরিতামৃত বা ভাগবতের সঙ্গে রাখিয়া থাকি ইহার কারণ কি, বা কিজন্য গীতগোবিন্দ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয়।

এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমার ক্ষমতা আশানুরূপ না হওয়ায় হয়ত আমি বহু ভুল করিয়া থাকিব ও আমার লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে

অসামঞ্জস্যের আরোপ করিয়া থাকিব। ভ্রমপ্রমাদ মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণ, বিশেষতঃ আমার ন্যায় অল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির। যদি সে প্রকার ভুল বা অসামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে, আমাদের সহিত সমমতাবলম্বী পাঠক তাহা সংশোধন করিয়া লইয়া আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। বঙ্গভাষা যাঁহার নিকট আজিও ঋণী, বাঙ্গালীর সেই প্রথম কবি বাঙ্গালীরই হস্তে যে প্রকার নিগ্রহ সহ্য করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমাদের সমমতাবলম্বী লোক এই বঙ্গীয় সমাজে যে আমরা না পাইব তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

এ প্রবন্ধে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের আলোচনায় স্থানে স্থানে রূঢ় কথার উল্লেখ করিয়া হয়ত অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছি। ধর্ম্মের নিন্দা আমার আদৌউদ্দেশ্য নহে,এবং জীবনের মধ্যে কোন ধর্ম্ম বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা কখনও করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রত্যেক পন্থারই ভাল ও মন্দ, সুব্যবহার ও কুব্যবহার, উন্নতি ও অবনতি, দুইটা করিয়া অংশ আছে। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মে মহামূল্য জিনিস থাকিলেও সাধারণ লোকে সেই ধর্ম্মের যে প্রকার কুব্যবহার ও অধঃপতন ঘটাইয়াছিল তাহা কাহারই অবিদিত নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কুব্যবহার ও কদাচারের উল্লেখই করিয়াছি।

সময়-তালিকা।

পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে একটী সময়-তালিকা সন্নিবিষ্ট করিলাম। পৃথক্ পৃথক্ মতানুসারে সকলেরই সময় দুই চারি বৎসর অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে। খ্রীষ্টাব্দ ধরা হইয়াছে, কারণ বর্ত্তমানকালে সাধারণের ইহাই অধিকতর বোধগম্য।

কুমারিল—সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়।

শঙ্করাচার্য্য—৭৮৮—৮২০ (জীবনকাল)

লক্ষ্মণ সেন—১১১৯—১১৯৯ (রাজত্বকাল)

অনঙ্গভীম—১১৭১ (রাজ্যারম্ভ)

রামানুজ—দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম্মপ্রচার।

মধ্বাচার্য্য—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

রামানন্দ—১৩৫০—১৪০০

রাণাকুম্ভ—১৪২৪—১৪৭৫ (রাজত্বকাল)

চণ্ডিদাস—১৪১৭—১৪৭৭

চৈতন্য—১৪৮৫—১৫৩৩ (অথবা ১৫২৭)

সনাতন—১৪৮৮—১৫৫৮

রূপ—১৪৮৯—১৫৬৩